রাজারহাট শিক্ষানিকেতন (উ.মা.)
সারস্বত

রাজারহাট শিক্ষানিকেতন

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
বহুমুখী শিক্ষা

স্থাপিত : ১৯৫৪

ইনডেক্স নং (Index No.) : বি-২-০৯৯ (B-2-099) মাধ্যমিক (M.P.)
উচ্চমাধ্যমিক : কোড নং (H. S. Code No.) 103179
ডাকঘর : রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগণা
পিন কোড নং : ৭০০১৩৫ ○ দূরাভাষ : ২৫৭৩-৬০৪৬

বঙ্গাব্দ
১৪২০

খ্রীস্টাব্দ
২০১৩

সারস্বত

সারস্বত

বিদ্যালয় পত্রিকা

S A R A S W A T A

A School Patrika

by

Teachers, Students & Others

প্রকাশকাল : ২০১৩

প্রকাশক :
রাজারহাট শিক্ষানিকেতন
রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগণা
কলকাতা - ৭০০১৩৫
দূরভাষ : ২৫৭৩-৬০৪৬

প্রচ্ছদ :
সচেতন

মুদ্রক :
চারু প্রেস
১০৩বি, ধনদেবী খান্না রোড
কলকাতা - ৭০০০৫৪
দূরভাষ : ২৩৬২-৮৬৬২

বর্ণ-সংস্থাপনায় :
আল্ট্রাটেক এন্টারপ্রাইজ
৪১৭, নারায়ণতলা পশ্চিম
কলকাতা - ৭০০০৫৯
চলভাষ : ৯৮৩০৩৫৯০৩০

বিদ্যালয়ের নিয়মাবলীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় :

১। প্রার্থনা সঙ্গীত— "জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে"

সমস্ত ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা পার্শ্বে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী সকলকে ১০-৪০ মিনিটে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে হবে এবং প্রার্থনা অনুষ্ঠানে ঘন্টা বাজলে বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে ছাত্র-ছাত্রীদের সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়াতে হবে। প্রার্থনা অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে বাধ্যতামূলক।

২। পোশাক— ছাত্রদের খাকি প্যান্ট, সাদা শার্ট, সাদা কেড্‌স, সাদা মোজা ও শীতকালে নেভী ব্লু সোয়েটার। ছাত্রীদের সাদা জামা (খাকি বর্ডারসহ), সাদা কেড্‌স, সাদা মোজা ও শীতকালে নেভি ব্লু সোয়েটার। ছাত্রছাত্রীদের সাদা জামা (খাকি বর্ডারসহ), খাকি চুড়িদার (খাকি বর্ডারসহ), সাদা ওড়না (খাকি বর্ডারসহ), সাদা কেড্‌স, সাদা মোজা ও শীতকালে নেভিব্লু সোয়েটার। ছাত্রদের খেলার পোশাক— কালো প্যান্ট, সাদা গেঞ্জি, সাদা মোজা ও সাদা কেড্‌স।

৩। বিদ্যালয়ের মোট পঠন পাঠন দিবসের ৭০ শতাংশ (৭০%) দিনে নির্দিষ্ট পোশাক ও ব্যাজসহ ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। উপস্থিতির হার ৭০%-এর কম হলে প্রধান শিক্ষকের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে না। বিদ্যালয়ে কোনদিন অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তী উপস্থিতির দিনটিতে অভিভাবকের পত্র অবশ্যই শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দিতে হবে। পাঁচ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে প্রথম উপস্থিতির দিন মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সহ আবেদন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট।

৪। কোন শ্রেণির কোন আসবাবপত্রের ক্ষতি হলে যে বা যারা ক্ষতি করেছে তার বা তাদের কথা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানানো সবারই নৈতিক দায়িত্ব। অন্যথায় ঐ শ্রেণির সকলকেই দায়ী করা হবে।

৫। পরীক্ষায় সময় অসৎ উপায় অবলম্বন করলে বহিষ্কার করা হতে পারে।

৬। বার্ষিক প্রসেস ফি ভর্তির সময় দিতে হবে। অপরাপর ছাত্রছাত্রীদের ঐ ফি নির্দিষ্ট সময়ে দিতে হবে। বাৎসরিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর পুনরায় অধ্যয়ন করতে ইচ্ছা করলে বার্ষিক দেয় ফি জমা দিয়ে সেই বছরের হাজিরা খাতায় নাম নথিভুক্ত করতে হবে। এক শ্রেণিতে পরপর দুবার অকৃতকার্য হলে বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়া হবে না।

৭। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট পিরিয়ডে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হবে। গ্রন্থাগারের পুস্তক অত্যন্ত যত্ন সহকারে ব্যবহার করতে হবে এবং ১৫ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে। অন্যথায় জরিমানা দিতে হবে। বার্ষিক পরীক্ষার আগে গ্রন্থাগারের পুস্তক জমা দিতে হবে। অন্যথায় প্রগতি পত্র দেওয়া হবে না।

প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পার্শ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকা, [illegible] এবং শিক্ষাকর্মীগণ

১।	শ্রী [illegible]	এম. এ. ([illegible]) [illegible], বি. এড্. ([illegible])	—	প্রধান শিক্ষক
২।	শ্রীমতি [illegible]	বি. এ., [illegible]	—	সহঃ শিক্ষিকা
৩।	শ্রীমতি [illegible]	এম. এ., বি. এড্. ([illegible])	—	সহঃ শিক্ষিকা
৪।	শ্রীমতি [illegible]	বি. এ. অনার্স ([illegible]) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষিকা
৫।	শ্রীমতি [illegible]	এম. এ. [illegible] ([illegible]) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষিকা
৬।	শ্রীমতি [illegible]	এম. এ. ([illegible]) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষিকা
৭।	শ্রী [illegible]	বি. এস. সি. অনার্স ([illegible]) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষক
৮।	শ্রী [illegible]	এম. এ. ([illegible]) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষক
৯।	শ্রী [illegible]	এম. এ. (বাংলা) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষক
১০।	শ্রীমতি [illegible]	এম. এ. (বাংলা) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষিকা
১১।	শ্রী [illegible]	এম. এ. (ভূগোল) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষক
১২।	শ্রী [illegible]	বি. এস. সি., এম. এস. সি. ([illegible]) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষক
১৩।	শ্রী [illegible]	এম. এ., বি. এড্. ([illegible])	—	সহঃ শিক্ষক
১৪।	শ্রীমতি [illegible]	এম. এ. [illegible] ([illegible]) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষিকা
১৫।	শ্রী [illegible]	এম. কম. বি. এড্. ([illegible])	—	সহঃ শিক্ষক
১৬।	শ্রী [illegible]	বি. এস. সি. (বি. এড্.)	—	সহঃ শিক্ষক
১৭।	শ্রী [illegible]	এম. এ. ([illegible]) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষক
১৮।	শ্রী [illegible]	এম. এস. সি. ([illegible]) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষক
১৯।	শ্রীমতি [illegible]	এম. এ. (ইংরাজি)	—	সহঃ শিক্ষিকা
২০।	শ্রী [illegible]	এম. এস. সি. ([illegible]), (বি. এড্.)	—	সহঃ শিক্ষক
২১।	শ্রীমতি [illegible]	বি. এস. সি., ([illegible]) এম. এ. ([illegible]) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষিকা
২২।	শ্রী [illegible]	এম. এস. সি. ([illegible]) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষক
২৩।	শ্রী [illegible]	বি. এ. ([illegible]) এম. এ. [illegible]	—	সহঃ শিক্ষক
২৪।	শ্রী [illegible]	এম. পি. এ. ([illegible]) 'এ' [illegible] ([illegible])	—	সহঃ শিক্ষক
২৫।	শ্রী [illegible]	এম. কম. ([illegible]) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষক
২৬।	শ্রীমতি [illegible]	এম. এ. (ইংরাজি)	—	সহঃ শিক্ষিকা
২৭।	শ্রী [illegible]	এম. এস. সি. ([illegible]) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষক
২৮।	শ্রী [illegible]	এম. এস. সি. ([illegible]) বি. এড্.	—	সহঃ শিক্ষক
২৯।	শ্রী [illegible]	এম. এস. সি. ([illegible])	—	সহঃ শিক্ষক
৩০।	শ্রীমতি [illegible]	এম. এ. (বাংলা)	—	সহঃ শিক্ষিকা
৩১।	শ্রী [illegible]	এম. এস. সি. ([illegible]), পি. জি., [illegible]	—	সহঃ শিক্ষক
৩২।	শ্রী [illegible]	এম. এ. ([illegible])	—	সহঃ শিক্ষক

৩৩। শ্রীমতি [illegible]	বি. এ. (বাংলা)	—	পার্শ্ব শিক্ষিকা
৩৪। শ্রীমতি [illegible] দাস	বি. এ. (ইতিহাস)	—	পার্শ্ব শিক্ষিকা
৩৫। শ্রী [illegible] সর্দার	বি. এস. সি. (অনার্স), এম. এস. সি. (পাঠরত)	—	পার্শ্ব শিক্ষক
৩৬। শ্রীমতি [illegible] চট্টোপাধ্যায়	এম. এ. (ইংরাজি)	—	পার্শ্ব শিক্ষিকা
৩৭। শ্রী [illegible] বিশ্বাস	বি. এস. সি. ([illegible])	—	পার্শ্ব শিক্ষক
৩৮। শ্রীমতি [illegible]	বি. এ., এম. এ. (পাঠরত)	—	আংশিক সময়
৩৯। [illegible]	বি. এ., এম. এ. (পাঠরত)	—	আংশিক সময়
৪০। শ্রী [illegible] পাল	[illegible]	—	গ্রন্থাগারিক
৪১। শ্রী [illegible]	মাধ্যমিক	—	প্রধান করণিক
৪২। শ্রীমতি [illegible] দাস	এম. এস. সি. ([illegible])	—	সহ করণিক
৪৩। পদটি খালি?			
৪৪। শ্রী [illegible]	অষ্টম	—	সহায়ক কর্মী
৪৫। শ্রী [illegible] বিশ্বাস	অষ্টম	—	সহায়ক কর্মী
৪৬। শ্রী [illegible]	মাধ্যমিক	—	[illegible] সহায়ক
৪৭। শ্রী [illegible]		—	স্বেচ্ছাসেবক
৪৮। শ্রী [illegible]		—	স্বেচ্ছাসেবক
৪৯। শ্রীমতি [illegible]		—	স্বেচ্ছাসেবিকা
৫০। শ্রীমতি [illegible] দাস		—	স্বেচ্ছাসেবিকা
৫১। শ্রীমতি [illegible]		—	স্বেচ্ছাসেবিকা
৫২। শেখ [illegible]		—	স্বেচ্ছাসেবক

বর্তমান পরিচালন সমিতি — ২০১৩

১। শ্রীমতি কৃষ্ণা বসু	সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (মা. বি.) জেলা উত্তর ২৪ পরগনা (সরকারী প্রতিনিধি)
২। শেখ [illegible]	(সভাপতি) অভিভাবক প্রতিনিধি
৩। শ্রী [illegible] দাস	(সহ-সভাপতি) অভিভাবক প্রতিনিধি
৪। শ্রী [illegible] ঘোষ	(সম্পাদক) পঞ্চায়েত সমিতি মনোনীত সদস্য
৫। শ্রী [illegible]	যুগ্ম সম্পাদক (প্রধান শিক্ষক)
৬। শ্রী [illegible] ঘোষ	সদস্য (অভিভাবক প্রতিনিধি)
৭। শেখ [illegible] হক	সদস্য (অভিভাবক প্রতিনিধি)
৮। শ্রী [illegible]	সদস্য (অভিভাবক প্রতিনিধি)
৯। [illegible]	সদস্য (অভিভাবক প্রতিনিধি)
১০। শ্রীমতি সোমা বসু (দাস)	সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি)
১১। শ্রী [illegible] দাস	সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি)
১২। শ্রী [illegible] বিশ্বাস	সদস্য (শিক্ষক প্রতিনিধি)
১৩। শ্রী [illegible]	সদস্য (শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি)

শিক্ষা-সংসদ

১।	শ্রী প্রদ্যুম রায়	প্রধান শিক্ষক	সভাপতি
২।	পার্টী খালি		
৩।	শ্রী শংকরকুমার পাল	সহ শিক্ষক	সদস্য
৪।	শ্রী অভিরাজ চক্রবর্তী	সহ শিক্ষক	সদস্য

স্টাফ কাউন্সিল

১।	শ্রী প্রদ্যুম রায়	প্রধান শিক্ষক	সভাপতি
২।	শ্রীমতি জয়া দাস	সহ শিক্ষিকা	সম্পাদিকা

পত্রিকা উপ সমিতি — ২০১৩

সভাপতি : শ্রী প্রদ্যুম রায়

সহ সভাপতি : শ্রী স্বপন কর্মকার, শ্রী শরদিন্দু দাস

সহ সভানেত্রী : শ্রীমতি সোমা বসু (নাগ), শ্রীমতি কাজল দাস (ঘোষ)

সম্পাদিকা : শ্রীমতি নীলিমা মণ্ডল

সহ সম্পাদক : শ্রী মানস পাল, শ্রী সুব্রত মণ্ডল, শ্রী কৌতুক বসু

সহ সম্পাদিকা : শ্রীমতি জয়া দাস, শ্রীমতি সুমিতা চক্রবর্তী, শ্রীমতি রেখা বসু

: সদস্য-সদস্যাবৃন্দ :

শ্রী প্রদ্যুম রায়, শ্রী স্বপন কর্মকার, শ্রীমতি নীলিমা মণ্ডল, শ্রীমতি সোমা বসু (নাগ), শ্রীমতি কাজল দাস (ঘোষ), শ্রীমতি জয়া দাস, শ্রী গৌতমকুমার কর, শ্রী মদনকুমার বৈদ্য, শ্রী শরদিন্দু দাস, শ্রীমতি সুমিতা চক্রবর্তী, শ্রী রাসবিহারী চৌধুরী, শ্রী আফতকুমার দাস, শ্রী অমূল্যানন্দ বিশ্বাস, শ্রীমতি রেখা বসু, শ্রী সমীর ঘোষ, শ্রী শংকরকুমার পাল, শ্রী সুব্রত মণ্ডল, শ্রী অভিরাজ চক্রবর্তী, শ্রীমতি রিম্পা মাকাল, শ্রী সত্যজিৎ কুণ্ডু, শ্রীমতি স্বাতী কুণ্ডু, শ্রী কৌতুক বসু, শ্রী সুশিয়াম মাঝী, শ্রী শুভাশিস দত্ত, শ্রী সৌমিত্র রায়, শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা নন্দী, শ্রী বিকাশ দাস, শ্রী ইন্দ্রজিৎ মাইতি, শ্রী অরুন দত্ত, শ্রীমতি শাশী মজুমদার, শ্রী অলোকানন্দ ঘোষ, শ্রী শুভঙ্কর সরকার, শ্রীমতি স্বপ্না রায়, শ্রীমতি মৌসুমী দাস, শ্রী নন্দদুলাল কর্মকার, শ্রীমতি শিলিন চট্টোপাধ্যায়, শ্রী গোবিন্দকুমার বিশ্বাস, শ্রী মানস পাল, শ্রী নিমাই কাঁড়ার, শ্রীমতি মৌমিতা দাস, শ্রী জগমোহন শর্মা, শ্রী সমীর নিয়োগী, শ্রী নিত্যানন্দ সরকার, শ্রী ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, শ্রী সুজিত ব্যানার্জী, শ্রীমতি তৃপ্তি ভট্টাচার্য, শ্রীমতি মৌমি দাস, শ্রীমতি সন্ধ্যা কর্মকার, সেখ আব্দুল আজিজ, শ্রীমতি কৃষ্ণা বসু, সেখ মতিউর রহমান, শ্রী শিবনাথ দাস, শ্রী প্রিয়তোষ ঘোষ, শ্রী প্রদীপ ঘোষ, সেখ ফজলুল হক, শ্রী দীপু বৈদ্য, রেজাউল ইসলাম, শ্রীমতি সুদীপ্তা বৈদ্য, মরজিনা খাতুন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

রাজারহাট শিক্ষানিকেতন-এর প্রতিষ্ঠাতা

শোভেন্দ্র কুমার দাস

স্মরণে

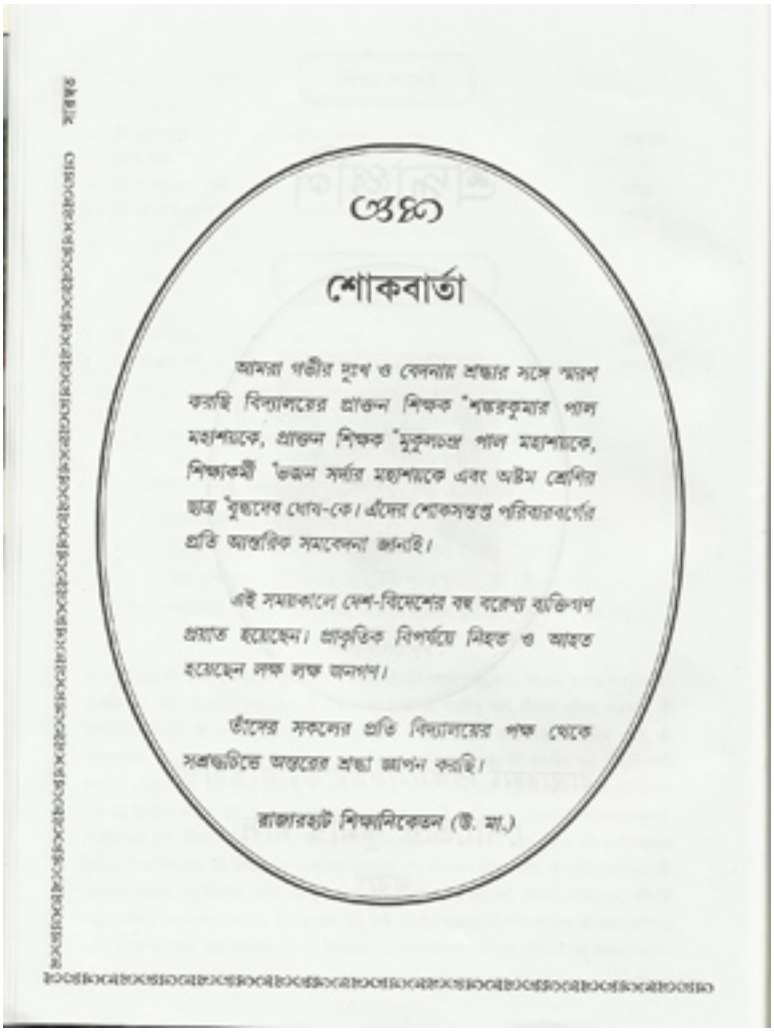

শোকবার্তা

আমরা গভীর দুঃখ ও বেদনায় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শঙ্করকুমার পাল মহাশয়কে, প্রাক্তন শিক্ষক মুকুলচন্দ্র পাল মহাশয়কে, শিক্ষাকর্মী ভজন সর্দার মহাশয়কে এবং অষ্টম শ্রেণির ছাত্র বুদ্ধদেব ঘোষ-কে। এঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

এই সময়কালে দেশ-বিদেশের বহু বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ প্রয়াত হয়েছেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নিহত ও আহত হয়েছেন লক্ষ লক্ষ জনগণ।

তাঁদের সকলের প্রতি বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধচিত্তে অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

রাজারহাট শিক্ষানিকেতন (উ. মা.)

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক/লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা নং
সম্পাদকীয়	নীলিমা মণ্ডল	১১
ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে		১২
আমাদের কথা	প্রসূন রায়	১৩
প্রার্থনা		১৪
সম্পাদকের কলমে	হিমাংশুশেখর ঘোষ	১৫
আমরাহাটি শিক্ষা নিকেতন	ইয়ার আলি	১৬
পুজো আসছে	সুমন পাল	১৬
মহান কবি	সাগর সর্দার	১৬
থেকো না অন্ধ	নীলিমা মণ্ডল	১৭
আমার কবিতা	রেজাউল রহমান	১৭
বর্ষা তুমি কোথায়	সেখ আলাউদ্দিন	১৮
সফর করো	তাহির রহমান	১৮
দুপুর মোর সাথী	সন্তু মল্লিক	১৮
আমার কিশোরবেলা	সুমিতা চক্রবর্তী	১৯
শরৎ	জুঁই পাল	১৯
বিদ্যালয়ের স্মৃতির পাতা	সেখ আসিফুল ইসলাম	১৯
গরমের দিন	সাহিদুল ইসলাম	২০
শিশু শ্রমিক	সত্য রায়	২০
মায়ের ভালোবাসা	রাকিবুল সরকার	২০
শিক্ষালয়	মৌমিতা লস্কর	২১
সুন্দর বাংলা	শাহজাহান আলী	২১
গাছ	অভীক দাস	২২
দেশপ্রেম	সেখ ইসরাফিল	২২
আমার বাড়ি	নীলিমা মণ্ডল	২২
আষাঢ় মাসের কবিতা	নুর আমিন মণ্ডল	২৩
নাম জেনেছ	অর্পিতা রায়	২৩
বইয়ের মেলা	সৌমিক ঘোষ	২৩

সূচিপত্র

স্বপ্ন এলোমেলো	অভিজিৎ নস্কর	২৪
জানু	আরিফ আলী	২৪
জাত আর জাতির মিলন	অভিজিৎ রায়	২৪
পরিবার	মৌসুমী ঘোষ	২৫
গাছ কেটো না	আব্দুল কাদের	২৫
বাক ও মোবিল	সলিমউদ্দিন মণ্ডল	২৬
প্রকৃতি	বিশ্বজিৎ পোদ্দার	২৬
পানকৌড়ি	সফিকউদ্দিন	২৬
আশা	পদ্মা মোল্লা	২৬
জীবন মানে কী?	সুমিতকুমার হালদার	২৭
মোদের প্রিয় গ্রাম 'রাজবাটী' গ্রাম	অভিষেক সরকার	২৭
নিরাশ্রিত	মেহবুব আলী	২৮
পাখি মানুষের আবেগ	শেখ আলমাসউদ্দিন	২৯
রহস্যের ভূত	নূর আমিন মণ্ডল	৩০
প্রকৃত বন্ধু	আব্দুল কাইউম মুন্সী	৩১
বৃক্ষ রোপণ (একটি গাছ একটি প্রাণ)	সঞ্জিত পাল	৩২
পানীয় জলের অপচয় রোধ	সঞ্জিত পাল	৩৩
নয়ন	রাজীব দে	৩৪
কে তুমি?	সানু গিরি	৩৫
শিলং	অনিন্দিতা সামন্ত	৩৬
মুদ্রার ইতিহাস	শুভাশিস দাস	৩৮
"আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ"	দীপিকা মণ্ডল	৪০
আমাদের দেশের রতন	বিমল সরকার	৪২
অতিলোভে শাস্তি	শঙ্কর সাউ	৪৪
শিল্পীর পরিচয়	অমলেশ পাত্র	৪৫
ব্রহ্মদৈত্য	আমিনউদ্দিন মিদ্যা	৪৬
গুপ্তধনের রহস্য	মমতা ঘোষ	৪৮
বিশ্বের ক্ষুদ্রতম	দীপা ব্যানার্জী	৫০
কম্পিউটারের জানা অজানা	তৃপ্তি ভট্টাচার্য	৫১
সবাই চলো মধু-বাড়ি	মানস পাল	৫৩
ধাঁ-ধাঁ — ১	আব্দুল কাইউম মুন্সী	৫৫
ধাঁ-ধাঁ — ২	অভিষেক সরকার / নূর আমিন মণ্ডল	৫৫
হাস্যকৌতুক	আরিফ আলি	৫৬

সম্পাদকীয়...

একসাথে কাজ করার মধ্যে থাকে আনন্দ, খুশি, খুব খুব ভালোলাগা। ছুটে চলা সময়ে সৃষ্টির জন্য সময়-সৃষ্টি করা খুবই কঠিন। সবার মুখে একটাই কথা সময় নেই। তবুও সময় আসে সময়ের হাত ধরে— 'সারস্বত' সাধনায়।

ভাবনাগুলো ফুটে ওঠে— গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ধাঁধা, হাস্যকৌতুক, রম্যরচনা প্রভৃতি এক-একটা ফুল-ফসলে। প্রষ্টা তা সাহিত্য বাগানে সাজিয়ে দেয় সযতনে।

উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৃষ্টি সম্ভারে মেতে ওঠে মন। এই তো পেয়েছি তারে। যে ছিল ঐ আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে সবখানে। সে নিল ধরা আমাদের অন্তরে। সে নিজের মতো করে নিজের মাঝে থাকুক।

লেখা-রেখা দিয়ে আমরা এঁকে নিই সেই ছবি— যা মানুষের মনের খোরাক হয়ে থাকবে চিরদিন।

আমাদের পত্রিকায় আমরা যা রাখি তা আমাদের চির-সম্পদ। স্মরণবেলায় স্মৃতি-পাতা খুলে দেখতে পাব— 'সারস্বত' শেখালো সৃষ্টি করতে, স্রষ্টা হয়ে উঠতে। দিল শক্তি, সাহস-প্রেরণা।

'সারস্বত' প্রকাশ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। প্রকাশের মহিমায় প্রত্যেক প্রাণ ভরে উঠুক এই প্রত্যাশা।

পত্রিকায় যারা এলো যারা এলো না, সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সম্মিলনে সমবেত হয়ে আগামী দিনে আরও আরও পথ চলায়— 'সারস্বত'।

অভিনন্দনসহ—
নীলিমা মণ্ডল
সম্পাদিকা — 'সারস্বত'

ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো ছাত্র জীবন। সকল ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষালাভের মধ্যে দিয়ে জীবনের সার্থকতা লাভের পথ খুঁজে পায়। ছাত্র জীবনের মূলবোধ, আদর্শ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা এইগুলি আমরা শিবি বিদ্যালয়ের সংস্পর্শ থেকে। দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলী আমরা অর্জন করি শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে। আমাদের জীবনের নানা সম্ভাবনা বিকশিত হয় এবং ভবিষ্যতের বীজ বোনা হয় বিদ্যালয়ের বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে। তাই তো আজ সকলকে আহ্বান জানিয়ে বলছি—

"বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে।"

আজ আমরা বিদ্যালয়ের পত্রিকা 'সারস্বত'-এর মাধ্যমে নিজেদেরকে কিছুটা হলেও বিকশিত করতে পারছি। তাই আজ আমরা উচ্ছ্বসিত কারণ প্রত্যেক মানুষই চায় তার নিজেদের সৃষ্টিকে প্রকাশ করতে, তেমনি আমরাও অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীরাও চাই নিজের সৃষ্টিকে প্রকাশ করতে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনি, ধাঁ-ধাঁ, হাস্যকৌতুক-এর মাধ্যমে।

বর্তমান এই গতিশীল যুগেও নিরক্ষরতা হলো এক বড়ো অভিশাপ। একে দূর করতেই হবে। তাই সমাজে কুসংস্কার ও বিচ্ছিন্নতাকে ঘুচিয়ে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছাত্র-ছাত্রীদের। তাই আমাদের বিদ্যালয়ের নিজস্ব পত্রিকা 'সারস্বত' হয়ে উঠুক আমাদের ভালো বন্ধু, পথ প্রদর্শক ও জ্ঞানের সম্মিলিত ভাণ্ডার।

আমাদের কথা

আমাদের বিদ্যালয় রাজারহাট শিক্ষানিকেতন (উ. মা.)। কতকাল আগে এই অঞ্চলে মুখরিত কলতানে এসেছে শিক্ষার্থী দল। 'বর্ষে বর্ষে দলে দলে', আসে বিদ্যা মন্দিরে চলে যায় তারা কলরবে।" শিক্ষা লাভের জন্য হাজার-হাজার ছাত্র-ছাত্রী আমাদের বিদ্যালয়ে এসেছে এবং আসবে। আমাদের প্রচেষ্টা থাকে— তাদের শিক্ষাদান করা। পঠন-পাঠন সহ নানান চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকাশ ঘটে বিদ্যালয়ের আঙিনায় এসে। আমাদের দায়-দায়িত্ব অপরিসীম। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ঐক্য মজবুত করতে হবে।

পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিন্যস্ত বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে (২০১৩) প্রায় ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত জন) সেই তুলনায় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষা সহায়ক ব্যবস্থাপনার অভাব আছে। মানবিক, বাণিজ্য, বিজ্ঞান বিষয় উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়ানো হয়। সহ-শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি (খেলাধূলা ও নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান) বিদ্যালয়ে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল সহ অন্যান্য বিষয়ে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। আমরা আরও অগ্রগতি চাই। বর্তমানে বিদ্যালয় সরকার পোষিত বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে।

সকলে একসাথে মিলিত হয়ে বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে, পরিচালন সমিতি সহ সকলের আন্তরিক অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমান পরিচালন সমিতির সহায়তায় বিদ্যালয় গৃহের সম্প্রসারণ হয়েছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় নতুন ১৩জন শিক্ষক/শিক্ষিকা অতি দ্রুত বিদ্যালয়ে যোগদান করবেন। সেজন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে এই বিশ্বাস রাখি।

আমাদের বিশ্বাস এই শুভকাজে আমরা অবশ্যই সফল হবো।

প্রদ্যুম্ন রায়
প্রধান শিক্ষক

প্রার্থনা / জাতীয় সংগীত

জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল-বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয় গাথা
জন-গণ-মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদকের কলমে

হিমাংশুশেখর ঘোষ, সম্পাদক

রাজারহাট শিক্ষানিকেতন (উ. মা.) রাজারহাট অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম বিদ্যালয়। শিক্ষানুরাগী বহুমানুষের প্রচেষ্টায় ২রা জানুয়ারি ১৯৫৪ সালে রাজারহাট শিক্ষানিকেতন এর শুভযাত্রা শুরু হয়।

শত-সহস্র শিক্ষার্থীর আগমনে এই বিদ্যালয় সুদূর অতীত থেকে বর্তমান এবং ভাবীকালে তার শিক্ষাধারাকে বহন করে চলবে এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশা।

বিদ্যালয়ে যেমন শিক্ষক-শিক্ষিকা-ছাত্রছাত্রী থাকে তেমনি থাকে পরিচালন কমিটি। সুষ্ঠুভাবে বিদ্যালয়কে পরিচালিত করতে পারলে, পঠন-পাঠনসহ বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। তাই পরিচালন কমিটি গঠিত হয়েছে।

বিদ্যালয় সম্পাদক হিসাবে সকলের কাছে আবেদন আমাদের বিদ্যালয়কে আমরা সম্মানের এবং গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যাবো। অনেক অভাব-অসুবিধা সমস্যা থাকবে। সেগুলো আমরা সমবেতভাবে প্রতিহত করবো।

সকলকে একসাথে একযোগে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতিতে এগিয়ে আসতে ও সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানাই।

গাভী যে তৃণটি খায়, করে জলপান,
তার সার দুগ্ধরূপে করে প্রতিদান।
পরদ্রব্য সাধু যদি করেন গ্রহণ,
জীবের মঙ্গল হেতু করেন অর্পণ।

— রজনীকান্ত সেন

রাজারহাট শিক্ষা নিকেতন

ইয়ার আলি

এই আমাদের রাজারহাট শিক্ষানিকেতন
        এখানে আছে অনেক ছাত্র-ছাত্রীগণ।
রাজারহাট শিক্ষানিকেতন,
        আছে কত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ,
তারা দেয় আমাদের শিক্ষা,
        এই আমাদের রাজারহাট শিক্ষানিকেতন,
সবাই স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে
        গড়ে তুলল রাজারহাট শিক্ষানিকেতন।
এখানে কত ছাত্র-ছাত্রী,
        বছর বছর আসে যায়
আমরা গড়ব মোরা
        আমাদের রাজারহাট শিক্ষানিকেতন।

খুড়ো সাহেব

সুমন পাল

আমার খুড়ো বেজায় বুড়ো
মাথায় মস্ত টাক
দিন-দুপুরে বসে দেখায়
ভেটভুতের নাক।
ছাতের আগায় ঘাঁটি ঘাটি
ঘুরঘুরিয়ে কাশে
তাই না দেখে খুড়ো সাহেব
তোমার মতো হাসে।
সেদিন আমার অনেকগুলো পাড়ার
সন্দেশের পিঠি,
টাকে বসে খেয়ে নিল
সন্দেশগুলোর পিঠি।

মহান কবি

সাগর সর্দার

১৮ বছর বয়স তবু ক্ষুধার জ্বালা মেটে
        কাজ চাই, তবু তোমাকে কাজ নাহি মেলে।
তোমার লিখিত হাতে সাহিত্যের মধ্যে তোমার সুর ধ্বনি
        হে মহান কবি সুকান্ত
ক্ষুধার জ্বালা মেটে দিয়ে তুমি লিখেছিলে
        চেয়ে দেখ সেই ইংরেজ নেই আর
সেই যুগ নেই, অন্যায় নেই আর
        নেই শুধু তুমি আমাদের মাঝে
তোমার জীবন দীর্ঘ নয়, তবুও সার্থক
        তেমনই তোমার কবিতাও সার্থক
হে মহান কবি লহ হে প্রণাম।
        প্রতিবাদী কবি তুমি
তোমার কলমে অন্যায়ের
        জানিয়ে তোমায় কবি প্রণাম।

হোক না অন্য

নীলিমা মণ্ডল (সহ. শিক্ষিকা)

সময় এখন এলোমেলো
একটুও নেই হাতে
ছুটিছে সময়
        দিন রাত্রির সাথে।
ভালো আছো?
একটুও নেই ভালো
সময় এলোমেলো।
সময় তো ঠিক সময়মতো
চলে নিয়মমতো
তবুও সময়—
        সময় আছে কারো?

সবার মুখে একই কথা
        যাকে এখন সময় নেই
সব কিছুতেই নেই-নেই।
না-এর বোঝা বয়ে চলি
তাই তো আমি ভেবে মরি
সময় খুঁজে সময় পাই...।

টুকরো টুকরো সময়গুলো
একসাথেতে করি জড়ো
সময় পাবার তাই পড়ো—
সেই সময়ে আছে সময়
একটু সবার জন্য
        এই ভাবনা হোক না বা অন্য।

আমার কবিতা

রেজাউল রহমান

আমি শুনতে না কোন মানা
মানব না কোন বাধা,
আমি করব তো জয় তোমাকে
ও আমার কবিতা।
দিবস আমি সারারাত জেগে জেগে
তোমার ও কাহিনি।
শোনার সারা দিশাকে
তুমি আমার জীবনী।
নদীর ঢেউয়ের মতো
আবেগে অরু ভরে যায়
তবুও তোমাকে আমার আত্মাতে জড়িয়ে
এসেছ তুমি আমার কাছে
স্বপ্নের জাল পাতিয়ে
তাই তো আমি রাখব সারাটা জীবন
তোমায় অন্তরে জড়িয়ে।

বর্ষা তুমি কোথায়

সেখ আজাদউদ্দিন

ওগো বর্ষা কোথায় তুমি ভাই, চলে গেল নাকি?
মাটি ফেটে যায় চাষা মরে যায় তুমি মোদের ভুলে গেলে নাকি?
সূর্য চলে গেল অস্তাচলে বাড়তে থাকে গরম,
গ্রীষ্মকালে পরিবেশ রুক্ষ চলতে থাকে চরম।
মাঠ-ঘাট ফাটে মাটিতে হয় নাকো চাষ,
সারা বাড়িতে উনুন জ্বলে না নেই মনুষ্যের বাস।
ধু ধু পরিবেশ আকাশটা নীল করে শুধু হাহাকার,
পশু, পাখি আর গাছপালা বলে কি হবে এবার।
খাল শুকালো, বিল শুকালো শুকালো পরিবেশ,
মাটিতে কোন চাষ হয় না নেইকো মাঠের চাষ,
ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে অন্যরকম দুর্দশা।

সঞ্চয় করো

তানিন রহমান

সঞ্চয় করো ভাই সঞ্চয় করো,
সঞ্চয় করে ভাই হও সবে বড়ো।
সঞ্চয় ছাড়া যে নেই কোন পথ,
সঞ্চয় করে ভাই গড়ি ভবিষ্যত।
সঞ্চয় করে যে যে, সেই তো জ্ঞানী,
সবাই সঞ্চয় করে মোরা জানি,
মৌমাছি দেখ ভাই একটুকু করে
একদিন দেখ কিনা মৌচাক গড়ে।
মৌচাক গড়ে যদি মৌমাছি সে
তুমি মানুষ তার চেয়ে বড়ো কীসে।
ফোঁটা ফোঁটা জলকণা করে সঞ্চয়,
দেখো পৃথিবীটাকে করল সে জয়।
বিন্দু বিন্দু জলকণা হয়ে সে বিশাল
গড়ে তোলে একদিন সাগর অতল
তাই বলি, অল্পে অল্পে করো সঞ্চয়
তোমাকে দেখে সবার জাগিবে বিস্ময়।

দুঃখ মোর সাথী

সঞ্জু মল্লিক

দুঃখের মাঝে জন্ম আমার
পাইনি সুখের ধারা
দুঃখ আমার জীবন সাথী
আমি সর্বহারা।
দুঃখের মাঝে জন্ম আমার
দুঃখ আমার হাসি
দুঃখ নিয়ে থাকি আমি
দুঃখ ভালোবাসি।
দুঃখের মাঝে জন্ম আমার
দুঃখে ভরা জীবন
দুঃখকে আমি সাথী করে
করব সবারে আপন।

আমার কিশোরবেলা

সুমিতা চক্রবর্তী (শিক্ষিকা)

পেতাম ফিরে, পেতাম যদি আমার কিশোরবেলা—
মনের মধ্যে ইচ্ছেগুলো নিয়ে যেত ভেলা।

বাবুই পাখির বাসাটাকে পাড়তে ইচ্ছা করে।
ঘুঘু পাখির বাসাটাকে ভাঙতে ইচ্ছা করে।।

আকাশের ঐ নীল আভাটা, পরতে ইচ্ছা করে।
গাছের পাতা সবুজটাকে, মাখতে ইচ্ছা করে।।

ঠিক দুপুরে চিলের সাথে, উড়তে ইচ্ছা করে।
ভেসে চলা মেঘগুলোকে ধরতে ইচ্ছা করে।।

ধানের ক্ষেতে, আরাম হয়ে, ঘুমোতে ইচ্ছা করে।
জলপুকুরে নির্জনেতে, ডুবতে ইচ্ছা করে।।

জোয়ার-ভাটায় ঢেউয়ের খেলা দেখতে ইচ্ছা করে।
ইচ্ছামতীর মনের কথা, জানতে ইচ্ছা করে।।

সবদিন যে নদীর সাথে খেলাধুলো তাই—
মনের মধ্যে জীবন চলা পড়ে গেছে তাই।
আমার কিশোরবেলাও আজ,
হারিয়ে গেছে তাই।।

শরৎ

জুঁই পাল

শরৎ যখন মেঘের সাথে আসে
শিউলি তখন মুখ লুকিয়ে হাসে,
মাঠে আলো করে ফোটে তখন কাশ
সাদা মেঘে ভরে যায় আকাশ,
মোহিনী সাদা ফুলগুলো ফোটে যখন উঠোনে
শারদীয়ার আমেজ লাগে সব বাঙালির মনে,
বাংলা যখন মেতে উঠেছে সাজো সাজো রবে
দুর্গাপূজা বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসবে।
লক্ষ্মীপূজা শেষ যখন খারাপ লাগে মন
অপেক্ষায় রইলাম শরৎ, আবার আসবে কখন।

বিদ্যালয়ের স্মৃতির পাতা

সেখ আসিফুল ইসলাম

একরাশ কোলাহলের খুঁটি
সবার মনকে করে যে ছুটি।
জীবনের স্মৃতির পাতায়
সুখ, দুখ যে এক হয়ে যায়।
মনে পড়ে শাসন, আর ভালোবাসার ছোঁয়া
বিদ্যালয়ের জীবন যে সবুজতাকে পাওয়া
বন্ধু-বান্ধব সহপাঠীদের বিচ্ছিন্ন হওয়া
নতুন করে দুখ মনকে আহ্বান দেওয়া।
সব কিছু নিয়ে স্মৃতির পাতায়
লাল নীল রঙ যা এক হয়ে যায়।
বিদ্যালয় জীবনের এই স্মৃতি
রইবে চির জাগি।

গরমের দিন
সাহিরুল ইসলাম

গরমেতে গেলাম পুড়ে,
বর্ষা তুমি কত দূরে?
চলে এসো তাড়াতাড়ি,
নাহলে এবার করবো আড়ি।
তোমার জলে ভিজব বলে,
বসে আছি চুলটি খুলে।
কানটি ধরে মায়ে বলে,
কে দেখবে সর্দি হলে?

শিশুশ্রমিক
স্বপ্না রুদ্র (শিক্ষিকা)

কালো কালো মেয়েগুলো
কাজ করে সারাদিন,
এ বাড়ি ও বাড়ি ঘোরে—
খাটে ওরা খুব জোরে
বয়স আট কি দশ
বাসন মাজে ঘস ঘস
ঘর মোছায়
জল তোলায়
টিফিন গেলিয়ে মন ভোলায়
অল্প খেয়ে পেট ভরানো
রান্নাঘরের কাজ সারানো
তেলো চুল, ছেঁড়া জামা
কর্তাকে ডাকে ও মামা—
মামা কিন্তু বড় পাকা
শিশু শ্রমিকের মন বোঝা।

মায়ের ভালোবাসা
রাকিবুল পুরকাইত

সবাই বলে মা,
মায়ের দাম কি হয়?
পৃথিবীতে মায়ের কোন নেই তুলনা
প্রতি রাতে আদর করে
ঘুম পাড়ায় মা।
খাই থাকে বড়ো হয়ে,
দুঃখ দিও না।
মাগো তোমার নেই তুলনা
রুগ্ন শিশুর পাশে বসে,
প্রহর গোনে মা।
ভালো-মন্দ কিছু হলে,
আগে দেখে মা,
খাই থাকে বড়ো হয়ে
ব্যথা দিও না।
মাগো তোমার নেই তুলনা।

শিক্ষালাভ

মৌমিতা নস্কর

পড়াশুনা শেখার জন্যে
    নেই কোন বিশ্রাম,
তাই তো ছাত্রছাত্রী জীবন
    দিচ্ছে বলিদান।
বাবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর
    মায়ের শাসন মেনে
খেলা ভুলে মনোনিবেশ
    করেছি শিক্ষালাভে
গল্পগুচ্ছ শরৎচন্দ্র
    এসব পড়ার নয়।
পড়তে হবে স্কুলের পড়া
    নইলে ফেলের ভয়।
শিক্ষা মানেই 'স্মার্ট' হওয়া নয়
    শিক্ষা 'মানুষ' হওয়া
শিক্ষা জীবন গড়তে শেখায়
    'শিক্ষা'— কিছু জানার।
সবাই বলে উকিল কিম্বা
    ডাক্তার হতেই হবে।
কেউ বলে না— 'সোনার ছেলেকে
    মানুষ হতেই হবে'।

সুন্দর বাংলা

শাহজাহান আলী

সুন্দর ফুল আর সুন্দর ফল,
    শুধু বাংলাতেই ফোটে।
সুন্দর বৃক্ষ আর সুন্দর গৃহ,
    শুধু বাংলাতেই ফোটে।
স্নিগ্ধ বাতাস নদীর কলধ্বনি,
    বাংলার চির সোনামণি।
অপরূপ রূপ বাংলার স্বরূপ,
    আর কোথাও তো দেখিনি।
গাছগুলো ফলে ভরা, দীঘিগুলো জলে ভরা,
    কোথায় আর পাবে?
সবুজ উদ্ভিদ আর সুন্দর ছায়া,
    কোথায় দেখা যাবে?
আমি গর্বিত,
    আমি এই বাংলার সন্তান
    তাই বাংলার গাই জয়গান।

গাছ
অসীম নাথ

যদি কথা বলতো গো,
মানুষের সঙ্গে লড়তে।
তাহলে মরতো না,
মানুষের অত্যাচারেতে।
        আমি আজ থেকে বলি সবাইকে,
তুমি গাছের জন্যে যেন,
        শক্তি দিয়ে আসো রক্ষে।
এ জন্মে সহিল যত অত্যাচার।
        পরের জনমে যেন তার প্রতিকার।
মানুষ পায় যেন বৃক্ষের জন্ম,
        বৃক্ষ পায় যেন মানুষের জন্ম
বুঝিবে গত জনমে করেছিলাম ভুল,
        মনে যেন পড়ে তখন এ জন্মের ভুল।
বুঝিবে তখন সে কেন দিয়ে করেছিল, বৃক্ষকে অত্যাচার
        তাই সহিতে হবে নিজেকে অত্যাচার।

দেশপ্রেম
সেখ ইসরাফিল

দেশের জন্য যারা দেয় প্রাণ,
        তাদের স্মৃতি থাকে চিরকাল।
দেশের জন্য যারা মরে,
        তারাই চিরকাল অমর হয়ে রহে।
দেশকে যারা ভালোবাসে,
        তাদের জানাই প্রণাম।
দিকে দিকে তাদেরই নাম।
তাই আমি বলি দেশের জন্য দাও প্রাণ।
        দেশকে ভালোবেসে।
তবেই তুমি অমর হয়ে রবে,
তবেই তোমার স্মৃতি থাকবে চিরকাল।
তবেই তুমি হবে দেশপ্রেমিক।

আমার বাড়ি
নীলিমা মন্ডল (শিক্ষিকা)

ছোট্ট নদীকূলে—
আমার ছোট্ট ঘরখানি
বয়ে চলে ছলাৎ ছলাৎ পানি,
দুটি ঘাটে দুটি ডোবে
রাঙা আবীর রঙে
উজ্জ্বল আকাশ—
অথৈ ভরা থাকে।
ঢেউ-এর ঢেউ-এ—
দোলে যে নাওখানি
বয়ে চলে ছলাৎ ছলাৎ পানি।
কত নাবিক যায় যে ভেসে—
পাড়ি দিয়ে দেশ-বিদেশে
গানের সুরে গেয়ে ভাটিয়ালি
মন যে আমার হারায় খালি-খালি।

জীবন আমার জলের সাথে
চলে সাগর পানে—
কোথায় যে তার কোন্ ঠিকানা
মন কি খবর জানে?
সেই অজানা জানতে গিয়ে
দুঃখ সুখ বুকে নিয়ে—
দিই যে আমি পাড়ি,—
যেথায় আবার বাঁধি ঘর—
সেই তো আমার বাড়ি।

আষাঢ় মাসের কবিতা
নূর আমিন মন্ডল

খাতা-কলম নিয়ে বসে আছি সদ্য—
আষাঢ় মাসে লিখতে হবে কবিতা পদ্য,
সারাদিন কালো কাঁথা গায়ে মেঘ আকাশে—
ভিজে ভিজে বাগানের মুখ হল ফ্যাকাশে।
টিনের ঘরে বসে কেটে যায় বেলাটি—
ভেস্তে গেল ছেলেদের ফুটবল খেলাটি।
কোথাও হাঁটু জল, কোথাও বা কাদা—
পিছলে গিয়ে পড়ে গেল পাড়ার এক দাদা।
জানালার পাশে বসে আমি খাতা খুলে গেলাম—
তাই দেখে বাবাকে আমি সাহায্য করতে গেলাম।

লাখ সেলাম
অর্পিতা রায়

বাংলাদেশের সাত কোটি ভাই
তাদেরই আমার লাখ সেলাম
বুকের রক্ত দিয়ে তোমরা
প্রমাণ করেছ নও গোলাম।
রুমী শাহীন সর্দার মোল্লা
দেখেছো আর ফুলকি হানে।
প্রমাণ করেছ মুক্তি কৌশল
বাঙালি জাতিরেও লড়তে জানে।
অন্যায়ের উঠে হাহাকার
তোমার দেশের প্রতি ঘরে।
'স্বাধীন' আর 'সেলাম' জাতিরেও
তাদেরই প্রতিদান করে যাবে।
কেমন না মায়ের হৃদয়ের ধন
তোমরা বাংলার ভাই।
মাতৃভূমিকে বাঁচিয়েছে প্রাণ
এর চেয়ে কি বা চাই।
বাংলাদেশের সাতকোটি ভাই
তাদেরই আজকে লাখ সেলাম।।

রথের মেলা
মৌমিতা ঘোষ

এক যে ছিল রথের মেলা,
বসত শুধু রথের বেলা।
কত মেলায় কত খাবার
করত সবাই এ হাত ও হাত।
কেউ খেত ফুচকা কেউ খেত আইসক্রিম
কেউবা দেখত না খেয়ে খেলায় ছিল।
কেউবা খেত জিলাপী আবার
কেউবা মেলা থেকেই বাড়ি ফিরত।
আজকে গেলাম বাবার সাথে।
আবার আসব পরের দিনে।
আসবো আবার উৎসাহে।
মিশবো আবার সবার সাথে।

স্বপ্ন এলোমেলো

অভিজিৎ নস্কর

এখনো কি তুই স্বপ্ন দেখিস?
সেই নির্জন দুপুরে।
হারিয়ে ফেলে নিজেকে
এখনো কি তুই খুঁজিস?
এখনো কি তুমি বন্দী—
ঘুমিয়ে ছাদের ঘরে শেষ।
তোর মনের কবিতার পাতাগুলি?
এখনো কি তোর মনের কোণে
খুঁজে পাস রোদ্দুর মাখা সেই
আপন স্মৃতিগুলো?
রবিন দাই-এর পাতার ফাঁকে
শুকনো সেই গোলাপগুলো?
এখনো কি জীবন কাড়ার তারে
এলোমেলো হয়ে যায় তোর মন?
ঠিক জানি না, এখনো কি বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যা
ভিজে যায় তোর দু-চোখের কোণ...?

রামু

আরিফ আলী

আছে মোর আছে ছাগল একখানি
নাম তার 'রাম' দিয়েছে মোর নানি।
একটুকু ছিলো যখন এনেছি তাকে বাড়ি
শুধু ভয় পেতো দেখলে বাবার মোটরগাড়ি
সেই শুধু তার ঘাস আর অনেক কাঁঠাল পাতা
সময়ে না দিলে রামু দেওয়ালে ঠুকতো মাথা।
অফিস থেকে ফিরে বাবা যখন রামুকে ডাকে আয়ে
ছুটে এসে আনন্দে সে দুটি পা তুলে নাচে
রামুকে সবাই ভালোবাসি আমিতো রাখি কাছে
ভয় পাই শুধু মায়েকে, চোখে না দেয় পাছে।

জাত আর জাতির মিলন

অভিজিৎ রায়

কে বাঙালি, কে আসামী, কে গুজরাটী, কে নেপালী
পাঞ্জাবী শিখ বৌদ্ধ মুসলমান?
মোরা ভারতমাতার সবাই যে সন্তান।।

আকাশ দেখ কেমন নীরব, আপন মহিমায়
বনে বনে কতই ফুল পাখিরা গান গায়,
নদী যেমন ছুটে চলে, মিশিয়ে তৃষ্ণা তাদের জলে
বিরাম তাতে নাই।।

আলো দেখ ঘুচায় কালো, রাতের অন্ধকার,
আগুন দেখ জীবের, জীবন নাইতো গৌরব।
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও তারা আপন কাজে আত্মহারা।।

ফুলের মতো একই সময়ে মোদের চলা চাই।
চলার পথে একই সুরে আছে আপন ধারা।
স্বপ্ন দিয়েছে সকল ফুলে তাই যদি মোরা কাঁটাকে তুলে
শত্রু তখন আসবে কাছে দুলবে দুটি কান।
মোরা ভারতমাতার সবাই যে সন্তান।

পরিবার

মৌসুমী ঘোষ

আমার নাম মৌসুমী,
        পরিবারে আমি খুব সুখী।
পরিবারে আছে মা-বাবা-দাদা,
        সবে মোরে বাসে ভালো,
কেউ করে না মোর প্রতি মুখ কালো।

বাবা হলেন একটু রাগী
        মা হলেন খুব ভালো
দাদা হলো খুব রাগী
        এদের আমি খুব ভালোবাসি।

বাবা একটু বকলেও
        মা বকে না,
দাদা একটু রাগলেও
        কিছু মনে আসে না।

আমাকে নিয়ে তাদের সব স্বপ্ন
        আছে সব আশা,
পূর্ণ করবো আমি তাদের সমস্ত আশা
        ঈশ্বর তুমি আমার একমাত্র ভরসা।

গাছ্ কেটো না

আব্দুল কাদের

গাছ কেটো না, গাছ কেটো না,
        গাছ কেটো না তোমরা।
গাছেরও যে প্রাণ আছে,
        বোঝো না কী তোমরা?

গাছ আমাদের খাবার যোগায়,
        গাছ আমাদের প্রাণ।
গাছ ছাড়া এই পৃথিবীটা
        তৈরি হয় মরুস্থান।

গাছছাড়া বৃষ্টি হবে না,
        দেখা দেবে খরা
মানুষ তখন বুঝতে পারবে,
        কী ভুল করেছিলাম মোরা।
সেই জন্য বলছি মোরা,
        গাছ কাটা বন্ধ কর,
গাছ না কেটে গাছ লাগিয়ে
        জীবনটাকে ধন্য কর।

কাক ও কোকিল

সলিমউদ্দিন মণ্ডল

গাছের ডালে ফুল ছিল
খুশি হওয়ার দিন ছিল
মধুমাস সুরে সুরে
বাঁশি বাজায় প্রেমের সুরে
সেই এলো কালো কৌয়া
ফুলগুলোকে ধুলোয় লোটায়
অট্টালিকা হয়েছে পাড়ে
কাক কোকিল চিঁচিঁ করে
কোকিল বলে সবুজ গা
কাক বলে কোথায় যা।

পানকৌড়ি

সলিমউদ্দিন

পানকৌড়ি পানকৌড়ি
পানকৌড়ি মা
টিপির পাড়ে বসলে কেন
সঙ্গে নিয়েছো?
মাছ ধরাও শিখলে নাকি
একে আমার অর্থ কী?
আমার কথার জবাব দিতে
চাও না কেন মা?
পাঁকের আগে শিখে নিও
পরে জলে নামতে শিখ
নাইলে জলায় তলিয়ে যাবে
হদিস পাবে না।
ঝাঁকা কোমর জলে নামা
এত সহজ না।।

প্রকৃতি

বিশ্বজিৎ পোদ্দার

ভোর সকালে সূর্য ওঠে
সন্ধ্যা রাতে চাঁদ।
আমি দেখে ঝিকমিক করে
নদীর কুলুকুল বাঁধ।
তুমি ভালো এঁকে বেঁকে
দেশ দেশান্তর ঘুরতে
পাখিরা তার আপন মনে
আকাশ পথে উড়তে।
আপন মনে তুমি চাও
হ হ করে বাঁচতে।
বসন্ত আসে ফুলের গন্ধ
সারা বনানী মাতাতে।

আশা

পদ্মা কোলে

আমি শিশুর
আমি কখনো জীবন জয়।
রাজারহাট্টের শিক্ষানিকেতনে
আমার হাতের সেকেন্ডারী পড়া
আমার জীবনে এই দিনগুলো
থাকবে স্মরণ করা।
শিক্ষক-শিক্ষিকা যাঁরা আমার গুরুজন
আমার ওপর কিছু আশা
আমি রাখবো তাঁদের কথা।
আমি পড়ি, লিখি, দেখি, শুনি
এটাই আমাদের শিক্ষা।
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দেখে
জাগে আমার মনে প্রশ্ন,
আমিও কি হবো ঠিক
তাঁদেরই মতোই বড়?

জীবন মানে কী?

সুমিতকুমার হালদার

জীবন মানে কী?
কিছু কিছু ঘটনার সমষ্টি,
কিছু কথা, কিছু গান,
কিছু থাকে মনে অভিমান।
কিছু দুঃখ, কিছু হাসি
দুঃখ থাকে পাশা পাশি
কারো জীবনে হয়তো বেশি
কিছু কথা বলা হয়,
কিছু কিছু কথা সংগোপনে।
মুহূর্তের পরে,
হেঁটে চলে আনমনে।
কিছু সুখ কিছু ভালোবাসা,
আর কিছু স্বপ্ন আশা।
কিছু প্রত্যহ প্রত্যাশা
যার সাথে থেকে যায়
নিঃশব্দ হতাশা,
জীবনের রঙমঞ্চে
সবাইতো তুমি শুধু অভিনয়,
প্রবাহে প্রবাহে শুধু হয়,
পৃথিবীর সাথে নব পরিচয়।

মোদের প্রিয় গ্রাম 'রাজবাটী গ্রাম'

অভিষেক সরদার

আলো বাতাস ছায়ায় ঘেরা
মোদের প্রিয় গ্রাম
সেই গ্রামের নামটি হল
রাজবাটী গ্রাম।

গ্রাম মোদের ছোট্ট হলেও,
অসুবিধা নেই তাতে,
সুখ শান্তি সবার রেখে
থাকি একসাথে।

সূর্য যখন চলে গেলো দিনের ঐ শেষে
রাত্রিকে সাজিয়ে তোলে জোনাকিরা এসে।
সে যার কাজে যায় সকাল হলে
পাঠশালাতে পড়তে যায় শিশুরা সকলে।

হিন্দু-মুসলিম সকলেই থাকি পাশাপাশি
অন্যের দুঃখে দুঃখী হই, সুখেতে হই খুশি,
সব গ্রামের মধ্যেতে ঠিক আমাদেরই গ্রাম
সেই গ্রামের নামটি হল রাজবাটী গ্রাম।

নিউটাউন

মেহবুব আলি

ঐ দেখ সেই নিউটাউন ছিল আগে কী?
নিশ্চিহ্নে আর কুলিত ছিল এখন হল কী?
মাঠে মাঠে সোনার ফসল দিচ্ছে না উঁকি?
তারই মাঝে উঠছে এখন আজব শহর কী?
এস শুনু শোন তবে—
ছুটে আসে কুলিত দিল নয়ন জুড়ায়ে যায়,
ধীরু সময় জলে থাকে ঐ বন্দনে না শুকায়।
হাঁসপাখি আর পানকৌড়ি কত রকমের ছিল,
আনন্দেতে ঘুরত সবে মনের আনন্দে।
সন্ধ্যা হলে ফাল পাতা আর হরেক পাখির কলরোলে,
ঐ আনন্দে আলো সকালে পূর্ব গগনে সাজলো।
অতলিত পাখির ঝাঁক হতে বেড়াতো বিলে,
বিলে ধরা সব মাছগুলো থাকতো কুলির ঘরে।
কৌকিবতো সব বেড়িয়ে যত পেঁটিয়ে ধরতো মাছে,
এই বিলকে আরো থাকতো কত রকমের মাছ।
সোনালি রঙের আলোয় উঠত আর সবুজের সমারোহে।
[illegible] ঐ কুলিতে মুখিতো কত শব্দ যে।
সাপের খনি আরও খনি ছিল বিলের মাঝেতে,
সবুজ আর শস্যশ্যামল ছিল চারিদিকে।
তার মাঝে কবে স্বপ্ন রাস্তা এখন হলো যে।
[illegible] মাঠের শ্যামল খনি আর আছে ঐ বিলের পাশ,
বুক চিরে ঐ বইছে যে খাল চলতো কতো জলযান।

সুন্দরবনের সুন্দরী গরান গাছ যেখানে ঠেকাতে,
আসতো বণিক দলে দলে হরেক মালের পসরে।
ভুলটি গাছের জোয়ারে, নদীর দুই কূল ছাপিয়ে,
আসতো জল দেখেসে মনে আসতো বুঝি সাগরে।
সকলেরে ঐ শুভ দৃষ্টি পড়লো মাছের বিলেতে।
অবশ্যই দিয়ে আমি দিল অল্প মূল্য যে।
সরল দিনে মানুষগুলোর চাষ আবাদে চলত তো বেশ,
লাভ কিছু অর্থ পেয়ে খাটুনি গেল তাদের শেষ।
সরকারের ঐ বাসে খাবে সবার পেল ঐ তরুণ দল,
জমিনে ঐ শেষ হবে তার সারাবেলায় রোজগারে।
দুখের বদলে পাইবে তারা সর্বনাশের খেলাধুলায়।
মেয়েরা বিলের বুক চিরে ঐ রাস্তা দিয়ে রাজপথ,
দেখে আরো অনেক কিছু শহরে ধরা হাটবাট।
আকাশ ছুঁয়ে অট্টালিকা উঠছে তর তর করে,
কত কিছু হবে অবাক শহর পাবে বেশ জোরে।
অফিস হবে, কাছারি হবে, আরো হবে যে হাসপাতাল,
আরো হবে, কত হবে শুনে মাথা উঠিল ঘুলঘুলি।
নগরী সেজেছে বেশ আর ধনের আড়িয় সাজে,
দল-বাবুদের সঙ্গ ছেড়ে বেশে মেজো শহরে।
হাত মেরেছে সোনার বাংলার একার দেশে ঠিকটিকে,
শহর থেকে তাড়িয়ে দেবে সব মাটির কুড়েরে।

বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর,
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা?

— রামনিধি গুপ্ত

পাখি ময়ূরের আদেশ

শেখ আব্বাসউদ্দিন

পাখিরাজ মহুর একদিন সব পাখিকে নিয়ে তাদের সম্পর্কে দোষ-গুণের একটি মিটিংয়ের আয়োজন করল।

পাখিরাজ মহুর সব পাখিকে বলল এখানে সবাই উপস্থিত আছ তো, সবাই তখন চিৎকার করে বলল হ্যাঁ মহারাজ। আচ্ছা তাহলে আজকের সভা শুরু করা যাক। সবার প্রথমে মহুর, পাঁচাকে জিজ্ঞাসা করল, বলল পাঁচা তুমি রাতের বেলায় শিকারে যাও কেন, দিনের বেলায় যাও না কেন? পাঁচা বলল মহারাজ আমি খুব ক্লান্ত থাকি এবং চোখে দেখতে পাইনা সেইজন্য রাত্রে শিকারে যাই। আচ্ছা বেশ বেশ বসো। এবার বলুন শালিক আর চড়াই কিচির মিচির করে কেন? তোমাদের সুজনের জন্য আমার অন্য বন্ধুরা একটু শান্তিতে বিশ্রাম করতে পারে না। আমরা চুপ করে থাকতে পারিনা মহারাজ। আমাদের কেমন যেন একটা অসুবিধা হয় মহারাজ শালিক বলল। এবার পাখিরাজ ফিঙেকে বলল— ফিঙে তুমি সব পাখিদের সঙ্গে ঝগড়াটি কর কেন? ফিঙে বলল হুজুর আপনি তো জানেন আমি একসময় বকালিন চ্যাম্পিয়ান ছিলাম সেইজন্য পুরানো অভ্যেস ছাড়তে পারিনা। তাই একটু আধটু ঝগড়াঝাটি করি। কোকিল এবার তুমি বল তুমি অন্যের বাসায় থাকো কেন? কোকিল বলল, অপরাধ নেবেন না। মহারাজ আমি বাসা বানাতে পারি না। তাই লোকের বাসায় দিন যাপন করি। ছিঃ ছিঃ আমার রাজ্যে বাস করো বাসা বানাতে পারো না। এখনি নিজে নিজে বাসা বানাতে শেখো, তা না হলে তোমার সাজা মৃত্যুদণ্ড হবে। পাখিরাজ বলল সত্যি। বাবুইকে দেখে আমাদের গর্ব হওয়া উচিত। ফিঙে বলল, সত্যি বাবুই ভালো বাসা বানাতে পারে। পাখিরাজ বলল থাক ফিঙে তোমাকে আর ওর হয়ে সাফাই গাইতে হবে না। পাখিরাজ কোকিলকে বলল আজ থেকে বাবুইকে দেখে সব কাজ শিখবে বুঝেছো কোকিল? বাবুইয়ের এই অসাধারণভাবে বাসা বানানোর জন্য আমি আমার রাজ্যের অর্ধেক অংশ তোমার নামে দিয়ে যাবো এবং আমি আমার রাজ সিংহাসন তোমায় দিয়ে যেতে চাই ভাই। আর তোমাদের প্রত্যেকের বাসায় একটি করে হ্যারিকেনের ব্যবস্থা করে দেবো। এই কথা শুনে বাবুই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। পাখিরাজ বলল, তাহলে আজকের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করা যাক।

রহস্যের ভূত

নূর আমিন মণ্ডল

ছোটো বেলায় আমি ঠাকুরমার মুখে অনেক ভূতের গল্প শুনেছি। আমাদের গ্রাম খলেশ গঞ্জে নাকি অনেক ভূত দেখা যেত। রাত বারোটার পর ভূতেরা আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে একটি বড়ো তাল গাছ থেকে জোনাকির আলোর মতো মিট মিট করতে করতে মাঠে শ্মশানের দিকে চলে যেত। আবার কখনও ভূতেরা পুকুরের মাছ ধরে চুরে খেত। ভূতের তাণ্ডবে মানুষ রাতের বেলা ঘরের বাহিরে বেরোতে ভয় পেত।

এমন একদিন আমাদের পাশের গ্রামে একটি বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। কোলকাতা থেকে বড়ো শিল্পী সেখানে গান করতে আসবে। এই খবর শুনে আমার কয়েকজন বন্ধু এবং আমি সেখানে যাওয়ার মতলব আঁটিলাম। কিন্তু সেই অনুষ্ঠান শেষ হতে ভোর হয়ে যাবে শুনে যেতে ভয় করল। তবুও আমরা সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়লাম। সেখানে অনুষ্ঠান শেষ হলে ভোরবেলা আমরা মাঠের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফিরছি। তখন সূর্যের আলো তেমন ফোটেনি বেশ ভালোই অন্ধকার। এমন সময় আমাদের মধ্যে জগা নামে এক বন্ধু বলল ওরে বাবা! দূরে তাকিয়ে দেখ সাদা শাড়ি পরে কে মনে হচ্ছে যাচ্ছে, ভূত নয়তো? তারপর আমরা তাকিয়ে দেখলাম সত্যি। সাদা শাড়ি পরে কে হেঁটে যাচ্ছে। আমরা হাঁটা বন্ধ করে দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমাদের গা দিয়ে দর দর করে ঘাম বেরোতে লাগল। ভয়ে মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। আমার মনে হচ্ছে আমি পেছনের দিকে ছুটে পালাই। আমার বন্ধুরা মূর্তির মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর লক্ষ করলাম সাদা শাড়ি পরা ভূতটি বেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। হঠাৎ এক বন্ধু নাপ্টু বলল, তোরা দাঁড়া আমি ভূতের মুখ দেখে আসি, ভূত কেমন দেখতে হয়? আমরা ওকে একা যেতে দিইনি। বললাম, ঠিক আছে সবাই এক সঙ্গে গিয়ে দেখব, যা আছে কপালে। এই মনস্থির করে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। এমন সময় দেখলাম ভূতের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি। সাহস করে আমি বললাম, ও ঠাকুমা এত ভোরে কোথায় চললে। আমার কথা শুনে ভূতটি তখন দাঁড়িয়ে পড়ল এবং আমাদের দিকে তাকালো। ভূত দাঁড়িয়ে পড়া মাত্রই আমরা খুব ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই আমাদের দিকে তাকালো আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমরা এতক্ষণ যাকে ভূত মনে করে ভয় করছিলাম তিনি হলেন তপনের ঠাকুমা। এরপর আমরা একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে পুনরায় বললাম, ঠাকুমা আপনি এত ভোরে যাচ্ছেন কোথায়? আমাদের প্রশ্নে ঠাকুমা বললেন— "আমার নাতি অর্থাৎ ছোটো মেয়ের ছেলের খুব শরীর খারাপ, খবর পেয়েছি সকালে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। আমি বুড়ো মানুষ, সকালে বেরোলে হয়তো আমি পৌঁছানোর আগে ওরা বেরিয়ে পড়বে, তাই আমি ভোরবেলাই বেরিয়ে পড়েছি।"

প্রকৃত বন্ধু

আব্দুল কাইউম মুন্সী

রাইগাছি নামে একটি গ্রামে বিক্রম, বাবলু ও মানিক থাকত। তাদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল। তাদের মধ্যে মানিক ছিল একটু নীচু পরিবারের। কিন্তু মানিক খুব ভালো বন্ধু ছিল তাদের। বাবলু তাদের মধ্যে একটু স্বার্থপর ছিল। সে পরের ভালোমন্দ না দেখে আগে নিজের ভালোমন্দ দেখত। এদিকে বিক্রম ও বাবলু কোন জায়গায় যাওয়ার হলে তারা দুজনে ঠিক করত কোথায় যাওয়া হবে। কিন্তু মানিক-কে বললে মানিক যেতে পারত না পারিবারিক আয়ের সমস্যার জন্য। মানিক স্কুলের টিফিনের পয়সা থেকে কিছু পয়সা জমা করত। বিক্রম ও বাবলু একদিন ঠিক করল সিনেমা দেখবে। তারা দুজনে মানিককে বলল— "মানিক আজ আমরা সিনেমা দেখতে যাব। তুই যাবি?" মানিককে খুব বলার পর মানিক উত্তর করল— "হ্যাঁ যাব।" বাবলু, বিক্রম ও মানিক সিনেমাহলে সিনেমা দেখতে যাচ্ছিল, সেদিন ছিল শনিবার। তারা সেদিন খুব আনন্দ করেছিল। এমন সময় বাড়ি ফেরার পথে দুটো লোককে রাস্তায় দেখল তখন রাত ১০টা বাজে। বাবলু বলল, 'এরা নিশ্চয়ই কিডন্যাপার।' মানিক হঠাৎ বলে উঠল 'ওরে বাবা পালা, কিডন্যাপার আমাদের লক্ষ্য করে অগ্রসর হচ্ছে।' মানিক, বাবলু ও বিক্রম তিনবন্ধু ছুটতে থাকে এবং দুই কিডন্যাপারও তাদের ধরার জন্য ছুটছে। হঠাৎ বিক্রম হোঁচট খেয়ে রাস্তায় পড়ে গেল। তখন কিডন্যাপার বিক্রমকে হাতের নাগালে পেয়ে ধরে নিল। মানিক কিছু দূর গিয়ে থেমে বলল— 'বাবলু, বিক্রমকে ধরে নিয়েছে।' বাবলু বলল— "ওকে ছাড় আপন প্রাণ নিয়ে পালা।" একথা বলে বিক্রম আর নেই। কিন্তু মানিক গেল না। মানিকের হঠাৎ একটা বুদ্ধি উদিত হল, সে দেখল আস্ত পাথর আর একটি বড়ো ডান্ডা পড়ে আছে। মানিক প্রথম ব্যক্তিকে পাথর ছুঁড়ে মেরে জখম করে দিল এবং সে বীরের মতো শুধু বন্ধুত্বের জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হয়ে ডান্ডা দিয়ে তাকে ঠান্ডা করে বিক্রমকে উদ্ধার করল। দুই বন্ধু চম্পট দিল। বিক্রম বুঝতে পারল প্রকৃত বন্ধু কাকে বলে। বোঝা গেল ঃ

"বিপদের সময় যে বন্ধু পাশে থাকে সেই হল প্রকৃত বন্ধু।"

বড় যদি হতে চাও,
ছোট হও তবে।

— ঈশ্বর গুপ্ত

বৃক্ষ রোপণ (একটি গাছ একটি প্রাণ)

মানিক পাল

ভূমিকা : বনসৃজন যে পরিবেশ রক্ষার পক্ষে মূল্যবান তা বিশেষভাবে স্বীকৃত। প্রকল্পটি দীর্ঘস্থায়ী, এর সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। বৃক্ষরোপণের তাৎপর্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি স্তরে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যালয় স্তরে এই প্রকল্পটিকে সার্থকভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সচেতনতা ও বৃক্ষরোপণটিকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য আন্তরিক প্রয়াস।

সমস্যা : ২০০৫ বর্ষের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল শ্লোগান ছিল— "পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান শহরগুলি ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা।" নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য যেভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে সে সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। কংক্রিটের তৈরি শহরগুলিতে বৃক্ষের তৈরি সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। এর ফলে যে সমস্যা তৈরি হচ্ছে তা হল বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস, কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়া, ভূমিক্ষয়, আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রভৃতি।

সমস্যার গুরুত্ব : এই সমস্যাগুলি যদি সমাধান না করা যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিনতর হয়ে দাঁড়াবে। কারণ প্রাণরক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের সরবরাহ একমাত্র বৃক্ষের মাধ্যমেই সম্ভব। এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলি তো রয়েছেই।

সমাধান :

১) বৃক্ষ কাটা বন্ধ করতে হবে তার পরিবর্তে নতুন চারা রোপণ করতে হবে।

২) বিভিন্ন চারাগাছ আমাদের নানারকম ঔষধি ব্যবহারের কাজে লাগে। যেমন— তুলসী, সর্পগন্ধা, কুইনাইন, কুলেখাড়া এবং নয়নতারা ইত্যাদি চারাগাছকে প্রচুর পরিমাণে লাগাতে হবে।

৩) বিদ্যালয়ের আশেপাশে বৃক্ষরোপণ করতে হবে এবং বৃক্ষরোপণের দিক দিয়ে কড়া নজর দিতে হবে।

৪) গাছ কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং সকল মানবজাতি অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বনডাই অক্সাইড ত্যাগ করি ফলে পারস্পরিক ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু গাছ কাটার ফলে এই পারস্পরিক ভারসাম্য ব্যাঘাত ঘটতে দেখা যাবে ফলে আমাদের নানা রোগ-ব্যাধি দেখা যাবে এবং জটিল সমস্যায় পড়তে হবে ফলে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ দরকার।

"মরু বিজয়ের কেতন ওড়াও শূন্যে হে প্রবল প্রাণ"

পানীয় জলের অপচয় রোধ

মানিক পাল

আমাদের জীবনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলির মধ্যে জল অন্যতম। তাই চিরকথিত একটি কথা প্রচলিত আছে। তা হল "জলের অপর নাম জীবন।" কিন্তু বর্তমানে জলের বিভিন্ন উৎস থাকলেও পানীয় জলের সমস্যা থেকেই যায়। বিশেষত, বর্তমানে আধুনিক সমাজে 'দূষণ' ভীষণভাবে বেড়ে যাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জলের চাহিদা বেড়েছে এবং জলকে পরিশ্রুত রাখার নিত্য নতুন উপায়ও বার করা হচ্ছে। জলে দূষিত পদার্থের উপস্থিতি বিশেষত আর্সেনিক যুক্ত জল ব্যবহারে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। দেখা দিচ্ছে নানারকম চর্মরোগ যার নাম 'ব্লাকফুট ডিজিজ।' সেই কারণে পানীয় জলকে স্বাস্থ্যসম্মতরূপে ব্যবহার করতে মানুষ আজ সচেষ্ট হয়েছে।

পানীয় জলের গুরুত্ব : পানীয় জলের প্রধান উৎস ভৌমজলস্তর। কিন্তু বর্তমানে নানারকম দূষণ ও অতিরিক্ত জলের ব্যবহার এই ভৌমজলস্তরের হ্রাস ঘটাচ্ছে। ফলে বর্তমানে স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জলের অভাব দেখা দিচ্ছে। ভৌমজল ভূতলদেশ থেকে উপরে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠেছে দূষণগ্রস্থ এবং ব্যবহারের অনুপযোগী। তাই স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জলের চাহিদা বেড়েছে বর্তমানে।

পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা : উক্ত সমীক্ষার দ্বারা সমগ্র অঞ্চলে স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জল সরবরাহের প্রতি সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। পানীয় জলের উৎসগুলির মধ্যে দূষিত পদার্থের অনুপস্থিতি প্রয়োজন। জল যে পাত্রে রাখা হবে সেই পাত্রটি যাতে ক্ষতিকারক পদার্থযুক্ত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। জলদূষণ সম্পর্কে এবং মনুষ্যদেহে তার প্রভাব সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মনুষ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জলের অপচয় রোধ উক্ত সমীক্ষার উদ্দেশ্য।

"শিক্ষা সমাজের মধ্যে প্রয়োজনীয়
পরিবর্তন ঘটানোর একমাত্র উপায়।
শিক্ষার মাধ্যমে আমরা সমাজের
অকাল অন্ধকার দূর করে দিতে পারি।"

— ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

নয়ন

রাজীব দে

একটি গ্রাম ছিল সেই গ্রামে ছিল এক চাষী। সেই চাষীর নিজের কোন জমি বা জায়গা বলতে শুধু একটি মাত্র কুঁড়ে ঘর। সেই চাষীটির নাম ছিল ফকির। সে সেখানকার রাজার খেতে চাষ করত। ফকির এবং তার বৌ খয়রন। ভালো দিন কাটত তাদের। কিছুদিন পর তাদের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল। তারা সন্তানের নাম দিল নয়ন। নয়নের খাদ্য তারা আর জোগাতে পারছিল না, অর্থের অভাবে। খয়রন বাধ্য হয়ে রাজার খেতে আর গেল না। সে বাড়িতে মাটির পুতুল বানাতে লাগল। রাজার নির্দেশ ছাড়াই। আর রাজার হুকুম ছিল তার এলাকার মধ্যে বাড়িতে বা অন্য কোনখানে কাজ করলে আগে তার আদেশ নিতে হবে। কিন্তু খয়রন কোন আদেশ না নিয়ে মাটির পুতুল বানিয়ে বিক্রয় করতে শুরু করে এবং যে পয়সা পুতুল বিক্রি করে পায় তা দিয়ে ছেলের জন্য দুধ কিনে আনে। কিন্তু হঠাৎ একদিন সেনাবাহিনী নিয়ে রাজা তার গ্রাম ঘুরতে এলো। সে দেখল যে ফকিরের স্ত্রী পুতুল তৈরি করেছে। তাই দেখে রাজা তার বাড়িতে এসে বলল কার হুকুমে এইসব করছ? খয়রন বলল কারো হুকুম নিইনি মহারাজ। রাজা বলল, যে যা করে আগে আমাকে জানায়। সে বলল, মহারাজ আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। মহারাজ আমার একটি পুত্র সন্তান আছে। মহারাজ বলল, আমি তোমায় শাস্তি দিতে পারতাম কিন্তু তোমাকে আমি সাবধান করে দিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বার কেউ যদি একই ভুল করে আমি তাকে মাফ করব না। তারপর থেকে তারা সুখে জীবন-যাপন করতে শুরু করল।

(অসৎ পথে রোজগার করার থেকে, সৎ পথে রোজগার করে সুখে থাকা ভালো।)

ধরণী এগিয়ে আসে, দেয় উপহার।
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।

— নজরুল ইসলাম

কে তুমি?

সানু গিরি

আমার নাম ''সানু গিরি''। আমি রাজারহাট শিক্ষানিকেতন (উঃ মাঃ) স্কুলের সপ্তম শ্রেণির বিভাগ-খ-এর ছাত্রী।" আমরা থাকি রাজারহাট রেকজোয়ানী পর্বতপাড়া। আমাদের গ্রামে এক বা একাধিক লোকজন আমাদের পরিবেশটিকে বিষাক্ত করে তুলেছে। সে আমাকেও খুব বিরক্ত করে। আমি কিছুতেই তার পিছু ছাড়াতে পারছি না। আপনারা কী বলতে পারেন আমি তার পিছু কী করে ছাড়াবো? সে আসে রোজ আসে। বাবা তাকে বকে তাও সে আসে। মা তাকে বকে তবুও সে আসে। সবাই তাকে বকে তবুও সে আসে। আমি খেতে বসি তখন সে আসে। আমি যখন পড়তে বসি তখনও সে আসে। সে সবসময় আমার আশেপাশে থাকে। আমি ছোট থেকে বড়ো হয়েছি তবুও সে আসে। আমার পিছু ছাড়েনি। কিন্তু সে একা আসে না তার সাথে তার বন্ধুরা-বান্ধবীরাও আসে। আপনারা কী বলতে পারেন সে কে? সে হল 'মশা'।

তার জন্য ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি কত রকমের রোগ ছড়ায়। এর হাত থেকে বাঁচার উপায় আছে।।

১) সবাই মিলে পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২) বাড়ির আশেপাশে, আনাচে-কানাচে জল জমতে দেওয়া যাবে না।

৩) বাড়ির আশেপাশের নর্দমা, পুকুর, ডোবা ইত্যাদি পরিষ্কার রাখতে হবে।

৪) নর্দমার আশপাশে গ্যামাক্সিন ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি কীটনাশক পদার্থ দিতে হবে।

আরও বিভিন্ন উপায় আছে। সবাই যদি এইসব নিয়ম মেনে চলে তবে আমরা পাবো একটি রোগমুক্ত সুস্থ পরিবেশ।

আরো অনেক পোকা-মাকড় আছে যারা বিভিন্ন প্রকারের রোগ ছড়ায়। যেমন— মাছি। এই পতঙ্গটি কলেরা রোগ ছড়ায়।

"ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখা ভালো, কিন্তু যে স্বপ্ন জাগিয়ে রাখে তা আরও ভালো। কারণ সেই স্বপ্নই তোমাকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।।"

—এ. পি. জে. আব্দুল কালাম

শিলং

অলিভিয়া সাধুখাঁ

এই বিপুল বিশ্বের অনেক দেশে ভ্রমণ করতে শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণ সংক্রান্ত একটি আক্ষেপ প্রকাশ করে গেছেন। অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখার আগ্রহ মানুষের চিরকাল। এই দিকে নিয়ে অজানাকে জানার জন্য এবং অদেখাকে দেখার জন্য মানুষ বেরিয়ে পড়ে দেশের-বিদেশের আনাচে-কানাচে। ফলে আমাদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে মধুর।

বর্তমান যুগে এই ব্যস্ত দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমিতে মানুষের মন যখন অবসন্ন তখন মানুষ বৈচিত্র্যময় আকর্ষণের জন্য মনে প্রাণে ভ্রমণের তাগিদ উপলব্ধি করে। ভ্রমণে আমরা আমাদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণ ভাণ্ডারটি কিছুটা হলে পূর্ণ করতে পারি। দীর্ঘদিন ধরে একই জীবনযাত্রায় নিজেকে বদ্ধ করে রাখলে আমাদের মনে সংকীর্ণতা এবং মানসিক জড়তা সৃষ্টি হয়। ফলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব জীবনে প্রয়োজন।

গত বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে শিলং-এর ভ্রমণের স্মৃতি আজও আমার স্মৃতিপটে অম্লান হয়ে আছে। পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার আনন্দটা সবসময় একটা আলাদা স্বাদ এনে দেয়। আমার ছোটবেলা থেকেই শিলং-এর প্রতি আমার একটা আকর্ষণ ছিল। একদিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল পাহাড়, অন্যদিকে সবুজ ধানক্ষেত মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের ট্রেন।

গুয়াহাটি নেমে ট্যাক্সিতে করে শিলং রওনা হলাম। দূরত্ব মাত্র ১০৪ কিমি। হিমালয়ের এই প্রশস্ত রাস্তার মধ্যে দিয়ে ছুটে চলা গাড়িতে বসে থেকে প্রকৃতির সৌন্দর্যে রোমান্টিক অনুভূতি আমাকে প্রভাবিত করল। আর পাঁচটা শহর থেকে বেশ আলাদা এই শহর— কুলু মানালি সিমলা-দার্জিলিং।

মনে পড়ে গেল 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের কথা। কেননা এই শিলং-এর রাস্তাতেই ধাক্কা খেয়েছিল অমিত রায় আর লাবণ্যের মোটর গাড়ি। এই রাস্তাতেই শুরু হয়েছিল 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের সেই রোমান্টিক প্রেম। এই কথাগুলি চিন্তা করতে করতে পৌঁছে গিয়েছিলাম শিলং-এ। শিলং-এ যা দেখলাম তা হয়তো আজ আর বলে শেষ করা যাবে না। কী নেই? শহরের একদিকে রয়েছে পাহাড়। অন্যদিকে বিশাল বিশাল পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে জোড়া ঝরনা। যেন যমজ ভাই— বিশপ ও বিডন। মাঝে মাঝে হোটেলের ব্যালকনিতে এসে প্রকৃতির রূপকে খুঁজতে খুঁজতে মনে পড়ে গেল এই জন্যই হয়তো অমিত রায়ের অন্তরের মন ছুঁয়ে গিয়েছিল জলের অমোঘ আকর্ষণে। প্রেমিকা লাবণ্যকে বলেছিলেন আমার বাড়ি হবে নদীর এপারে, তোমার বাড়ি হবে নদীর ওপারে।

মনে ছোট ছোট স্মৃতি নিয়ে এগিয়ে গেলাম শিলং-এর দিকে। রেলিং বাঁধানো সরু রাস্তা দিয়ে পাহাড় চূড়ার দিকে হেঁটে চলেছিলাম, মাথার উপরদিকে তাকালে নীল আকাশ আর পাহাড়ের অপূর্ব রূপ ধরা দিয়েছে প্রকৃতির কাছে। এটি ছিল শিলং-এর সবচেয়ে উঁচু View point। উঁচু রেলিং-এর ধারে

এসে দাঁড়িয়ে অপূর্ব সৌন্দর্য নিয়ে বিস্তারিত হওয়া শিলং শহরটি। খেলনার মতো ছোট ছোট বাড়ি ও বাগান।

তারপর নিজের সৌন্দর্য উপভোগ করে নেমে সোজা চলে গেলাম শিলং-এর গলফ্ কোর্সে। যতদূর চোখ যায় ততদূর যেন সবুজ ঘাসে ভরা অন্তহীন সমুদ্র। তার মধ্যে টেডি-এর খেলার মত কলরবের দৌড়। দেখতে দেখতে বুঝতে পারলাম না কখন সূর্যিমামা আকাশ থেকে বিদায় নিয়ে তার লাল আভা আমাদেরকে উপহার দিয়ে গেছেন। এইভাবে শেষ হয়ে গেল একটি দিন।

পরের দিন শিলং-এর কাছে চেরাপুঞ্জি। দুইধারে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে সরু আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে গাড়ি করে যেতে যেতে উপভোগ করছিলাম প্রকৃতির সবুজ লীলা খেলাকে। পৌঁছে গেলাম চেরাপুঞ্জিতে যেখানে শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। পাহাড়ের কোলে জমে থাকা মেঘগুলিকে দেখে মনে হচ্ছিল মেঘগুলি যেন তার মায়ের কোলে ঘুমিয়ে রয়েছে। সামনে রয়েছে অপূর্ব ঝরনা। চেরাপুঞ্জি থেকে গেলাম মিজোরামে। এ এক কুমারী বন। কারণ এখনো পর্যন্ত কোন চোর বা শিকারীর হাত বা দাঁত ছুঁতে পারেনি এই বনকে। এই বনের ছোট একটি ডাল বা শুকিয়ে পড়ে থাকা ফুলেও কারোর হাত দেওয়ার অধিকার নেই। এই জঙ্গলের এক বিশেষত্ব আমার চোখকে আকর্ষণ করল। তা হল সবুজ পাতার উপর দিয়ে রডোডেনড্রনের লাল কন্যা, যা হয়তো কারও সাথে তুলনা করলে চলে না। মন ভরে গেল অপরূপ প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে।

শিলংকে দেখতে দেখতে কখন যে সাত সাতটি দিন কেটে গেল তা বুঝতে পারলাম না। এবার বাড়ি ফেরার পালা। কিন্তু মন ও হৃদয় জুড়ে থেকে গিয়েছে শিলং-এর ভ্রমণ স্মৃতি। যা আজও আমাকে, উদ্বেলিত করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য যে এত মনোরম তার প্রকাশ যেন আমাকে আপ্লুত করে যায়। পাইনবনের, মৃদু দোদুল দোলা। বর্ণীয় সৌন্দর্য, দেশের অপরূপ মাধুর্য আমার স্মৃতিতে চিরকাল সঞ্চিত হয়ে থাকবে। বারবার এ কথাই বলব—

"কত অজানারে জানাইলে তুমি...!"

Like the baseless fabric of this vision,
The could-capped towers, the gorgeous palaces,
The solemn Temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve;

— Shakespeare

মুদ্রার ইতিহাস

শুভাশিস ধর (অব. শিক্ষক)

অতীতে মানুষ ছিল একান্ত আত্মকেন্দ্রিক বা পরিবার কেন্দ্রিক গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তখন তার প্রয়োজন ছিল সীমিত। সরাসরি প্রকৃতি থেকেই অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থান জোগাড় করত। কালক্রমে কয়েকটি পরিবার একত্রিত হয়ে গড়ে তুলল গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। এই গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গুলো গড়ে তুলল ভিন্ন ভিন্ন জীবনধারা। এই গোষ্ঠীগুলি যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে এলো তখন জীবনধারায় দেখা দিল পরিবর্তন। এতদিন পর্যন্ত গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন এলাকার উৎপাদিত দ্রব্যের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। পরস্পর গোষ্ঠীগুলি সান্নিধ্যের ফলে বাইরের অঞ্চলের উৎপাদিত বা প্রাপ্ত জিনিস সম্পর্কে জানতে পারল এবং আগ্রহী হয়ে উঠল। তখন থেকেই লেনদেনের সূত্রপাত। ভিন্ন ভিন্ন এলাকার দ্রব্যের সাথে অন্য এলাকার দ্রব্যের বিনিময় করা হত।

গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় যখন বেড়ে গেল তখন দ্রব্যের বিনিময় হয়ে উঠল একান্ত প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন সামগ্রীর প্রত্যক্ষ আদান প্রদানের মাধ্যমে অসুবিধা দেখা দিল। ধরা যাক, বিনিময় করতে একজন একটি গাভী নিয়ে এলেন এবং আর একজন একটি কুমড়ো। উভয় উভয়ের দ্রব্য প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বিনিময় করা অসুবিধা হল দ্রব্যগুলির মূল্য ভিন্ন থাকায়। সরাসরি বিনিময়ের ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসাবে কয়েকটি বিশেষ সামগ্রীর ব্যবহার করা বেশি সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হল। আস্তে আস্তে এইসব জিনিস বিনিময়ের মাধ্যমরূপে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। সৃষ্টি হয় মূল্যের একক সম্পর্কে একটা ধারণা এবং মুদ্রা আবিষ্কারের এটাই প্রথম পদক্ষেপ।

খ্রিস্টপূর্ব তিন সহস্রাব্দ পূর্বে হরপ্পা সভ্যতার মানুষ যাঁরা ভারতবর্ষে প্রধানত সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে বাস করতেন, তাঁরা কৃষিপণ্যকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতেন। পরবর্তীকালে বৈদিক সভ্যতার যুগে অবশ্য লোকেরা গাভীকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করত। ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে আছে যে, কোন এক মুনি একশ, এক হাজার, এমনকি দশ সহস্র গাভীর পরিবর্তেও নিজের কাছে যে ইন্দ্রের প্রতিমূর্তিটি রয়েছে, তা বিনিময় করবেন না। কৃষিপণ্যের তুলনায় গাভীর মূল্য ছিল অনেক বেশি কারণ, গাভী বংশ বৃদ্ধি করতে পারে, দুধ দিতে পারে এবং মাল বহনও করতে পারে। কিন্তু সঞ্চয় করতে একাধিক গাভী পালন করার অনেক অসুবিধা ছিল। তাছাড়া ছোট কোন জিনিস কেনার পরিবর্তে একটি গাভী দেওয়া সম্ভব হত না এবং গাভীকে না মেরে ভাগ করাও অসম্ভব। আর মরার পর মাংসের দাম গাভীর দামের সমান হয় না। তাই বিনিময়ের এই মাধ্যম পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল।

বৈদিক যুগের আর্যগণ 'নিষ্ক' নামে ভিন্ন ভিন্ন সম্ভবতঃ সোনার গহনার বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতো। ঋগ্বেদের একটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে মুনি কক্ষীবান রাজা ভাবয়ব্যের কাছ থেকে একশটি অশ্ব এবং একশটি নিষ্ক পেয়েছেন। এটির থেকে প্রমাণ হয় যে বৈদিকযুগে গাভীর মত নিষ্কও সম্পদের প্রতীক বলে গণ্য করা হত। রাজ নৃপতিরা পুরোহিতদের দান হিসাবে 'নিষ্ক' প্রদান করতেন। ভারতবর্ষে সম্ভবত সোনা দিয়ে বিনিময়ের প্রথার শুরু হয় তখন থেকেই। দক্ষিণ ভারতের বড় বড় নদীর বালি ধুয়ে প্রচুর পরিমাণে সোনা পাওয়া যেত। লেনদেনের মাধ্যমে সোনা আসতো মধ্য-এশিয়া, আফগানিস্তান ও তিব্বত থেকে।

কিন্তু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ধাতুর ব্যবহার করা থেকে উদ্ভব হল পরিমাপ নির্ধারণের সমস্যা। [illegible] ... 1 তোলা = আনা = 12 মাষা = 12×7 রতি। [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] অধিকার রাজশক্তির বিশেষাধিকারে পরিণত হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

ভারতের মুদ্রা ড. পরমেশ্বরী লাল গুপ্ত।

Necessity, who is the mother of invention. - Plato (Greck Author & Philosopher in Athens (427 BC– 347 BC)

"আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ"

নীলিমা মণ্ডল (অব. শিক্ষিকা)

পথের শেষে পথের শুরু। এ-পথ চলেছে ধাবমান কালে-মহাকালে। এ চলার শেষ নেই। কবে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল কে বলতে পারে? রাজারহাট চলছিল— সেই কোন্ কালে, কে জানে? আজও চলেছে। তাই তো কতো পাল্টে যাওয়া, পুরানো পথ ধরে নতুন পথ পাড়ি। চেনা থেকে অচেনা, জানা থেকে অজানা। শত সহস্র মানুষের পায়ের ছাপ এঁকে দিয়েছে এ পথ। রেখে দিল তার বুকে কত শত স্মৃতি চিহ্ন। কত ঘটনার সাক্ষী এই পথ।

দু'দশকের বেশি সময় এই পথেই চলেছি— রাজারহাট। চোখে পড়েছে, আজও পড়ে অনেক কিছুই বদলে যাওয়া। নতুন কোন কিছু মেনে নিতে প্রথম— প্রথম যেন একটু কেমন লাগে। ধীরে ধীরে সয়ে যায়। কালের নিয়মে, সময়ের দাবীতে পরিবর্তন অনিবার্য। তবু পাল্টে গেলেও ফেলে আসা স্মৃতি— সত্তা— ভবিষ্যত ভাবী কালকে শোনায় সেই কথা— "তোমায় নতুন করে পাবো বলে, হারাই ক্ষণে-ক্ষণ।"

দেখতে দেখতে আমাদের স্কুলের গেটের কাছে কদম গাছটা কত বড় হয়েছে। ডালপালা ছড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ডেকে বলে— 'ওরে আমার মতো তোরাও বড় হ'। মেহগনি গাছে সবুজ পাতা সতেজ প্রাণ ছুঁয়ে কনকচাঁপা সুগন্ধ ছড়ায়। আবুল ভাইকে কতদিন আবদার করে বলেছি কটা ফুল পেড়ে দিতে। গাছগুলো সব আবুল ভাই লাগিয়েছে। ছেলের দল এখনও টের পায়নি। ঘরের পিছনে কনকচাঁপা করে কানাকানি।

আমাদের স্কুলে মাঠের মাঝখানে একটা কাঁঠাল গাছ ছিল। কাঁঠাল হতে দেখিনি। নজরুলের বাড়ির পাশে পুকুর। ছাত্ররা ফুটবল খেলার সময় পুকুরে বল পড়তো। গামছা পরে ছেলে দাঁড়িয়ে থাকতো ও-পার, জলে ফুটবল তোলা। সেদিন সোমাদি সে গল্প নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকা বন্ধুদের বলছিলেন। সে পুকুর, এখন বাড়ি-দোকান। হলুদ পাখি কদিন আগে সাধুখাঁদের যজ্ঞ ডুমুর গাছে বসে পাকা ফল খাচ্ছিল। লিচু গাছে লাল টুকটুক লিচু। লিচুর আমে লিচুর মেলা। গাছকটা এখনও বেঁচে আছে। ট্রান্সফার্মার কি. ডি. স্কুল কচি-কলরব। এটা তো দাঁতনবাগান ছিল। পাশে চারটি উঠছে— আম, লিচু, হরেক গাছে ফুলে-ফলে পাখির গানে যা ছিল মুখর, আগামী দিনে জন কলরবে তা হয়ে উঠবে কোলাহল। মানুষজন যাবে কোথায়? থাকবে কোথায়? যেখানে যত বেশি সুযোগ-সুবিধা সেটা তো মানুষ পেতে চাইবে। মানুষ চেয়েছে বলেই তো— সভ্যতার অগ্রগমন, অগ্রগতি। এ চাওয়ার শেষ নেই।

হে-কলার এইটি দি'র ঘর থেকে ঐ আকাশে দেখা সারসগুলো বৃষ্টিভেজা ডানা মেলে এখনও নেমে আসে রাজারহাটের আশপাশের বিলে। বিলটুকু বিক্রি হয়ে যাবে কিছুদিন পরেই। কথা যাবে কোথায়? সাইবেরিয়া থেকে সবুজ, ঘুঘিবিল কি একটুখানি ওদের জন্য রাখা যায় না? ভেবে দেখলে ক্ষতি কি?

'আমাকালীঁ'র মাথার ওপরে মস্ত মেঘের মেলা। শরতের বিকেলে মনে হলো মনেরিনের 'সোনার কোর্ট'। কি অপূর্ব! সুন্দর, মনোহর। আমি দেখতে পাই কি— এক ছাত্রী এসে আমাকে বলল— 'দিদি, দেখুন— দেখুন...' কোলাহল চিক্-চিক্। ঐ ছবি একেবারে মনে আছে। শরৎ আসছে। মেঘ মনকে বলে— 'মন রোজ, মেঘের সাথী ছুটে চলে নীল দিগন্তের পানে'/ এরোপ্লেনটি এর কাশফুল, শাপলা, শিউলি, মেঘের তুলো মেঘ, শারদীয়া শারদা'র আগমনী আনে।

'কালো দিদি— কালো'— ও শুধু ঘুম পাড়িয়ে যায়— কেন যে পালায় কেন। বিশ্বকর্মা পূজা আসছে যে, ঘুড়িতে মাঞ্জা দেবে খাওয়া-দাওয়া করবে না। বাবা বিটিতে, মা বকবে তবু এই কাজ করা চাই। 'কেন যে পালাল কেন। কি করবো দিদি। স্কুলে পড়তে গেলে শুধু ঘুড়ির কথা মনে পড়ে।' স্কুলে থাকতে আর ভালোলাগে না। বিকেল হলেই মন কেমন করে। বিশ্বকর্মাপূজায় কত ঘুড়ি কাটি? একোনওলো, পনেরো, ঘুড়ি অনেক— অনেক। মুখে কি তৃপ্তির, তৃপ্তির হাসি। এ তো সত্যি যন্ত্র। দু'বছর আগে সেকেন্ড দিদি ছাত্রদের কাছ থেকে জানা। এই যা। ঐ ঘুড়ির নাম ভুলে গেছি। ও তো অনেক কিছুই পারে, চৌ-কাট্টা-চৌ-কাট্টা ঐ আকাশ ছুঁতে, আকাশে উড়তে। আমি পারি কৈ?

হিরণ, অমিত, বিমল, মানুষ— কোথায় কবিতায় বলে 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান / মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ'/ তাইতো সম্প্রীতির পথ চলা আমাদের চলেছে ঐ কবিতার ছন্দে-ছন্দে। এস. ওয়াজেদ আলির ভারতবর্ষ— ''সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে...' সামনের দিকে পথ চলেছে পথে পথে। কত মানুষের আগমনে রাজারহাটের পথে পথে চলে নতুন মানুষজন। জীবনপথে চলতে চলতে সেবা পথে আজিও চেনায় নতুন পথ সন্ধানি।

অবশেষে রাজারহাট শিক্ষানিকেতন আমার বর্ষ ঋতু পার করে চলে কত শত সাথীর পথে। পুরানো পথে নতুন পথ খুঁজে ফিরতে হয় শেষ থেকে শুরু পথে। 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু, এখন ওগো কর্ণধার, তোমারে করি নমস্কার...।'

'শিক্ষক-দিবস', ছেলে-মেয়েরা হাতে করে কার্ড, লেখা, পাতা, ফুল আরও কত কিছু। সাথে ছুটে যেতে নীলাকাশে, সবুজ মাঠে, শরৎ-কাশে কাছাকাছি পুজো-পুজো গন্ধ ভাসে, মন উড়ু-উড়ু। 'হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে...' প্রবল প্রাণের আবেগে-আনন্দে উচ্ছ্বাসে উল্লাসে পথে-পথে পক্ষীরাজের মতো পরিক্রমা। ছুটি তখন থাকলে কত পথ পাড়ি দিতে মনে হচ্ছে জীবনে।

তোমার কিছু নাই। লেখাপড়া নেই, শুধু দুষ্টু বুদ্ধি। ওরে বাছা, আগে লেখাপড়া কর মন দিয়ে, সব পথ পাড়ি দিবি। পথ ডেকে বলে, তুমি পথ-পথিক, পথিক তুমি পথের সন্ধান খুঁজিয়ে নে— এই খেলা। তাই হবে— তাই হবে। পথেই বেরিয়েছি পথ খুঁজে পথ চলতে। তুমি আমার পথ দেখাও। আমায় পথ চলা শেখাও— 'তুমি আমার আরো করো প্রভু / পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু...'

সামনে এগিয়ে যেতে যেতে পথে পথে পেয়ে যাবে— কত স্বপ্ন-আশা-ভরসা-ভালোবাসা। তাকে চিনিয়ে দিতে— পরিচয়-পরিচিতি— 'রাজারহাট শিক্ষানিকেতন।' আমরা হাতে-হাত রেখে মনের-পুষ্পে আন্তরিক মন দিয়ে পাড়ি দেবো শত-শত পথ। ''এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন / এককার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন...''

পথ-পথ দেখাবে, শুরুর শেষে, শেষের শুরুতে। 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা— কে বলবে...!'

আমাদের নেপাল ভ্রমণ

দিবস সরকার

গ্রীষ্মকালের প্রথমেই আমাদের নেপাল ভ্রমণ স্থির হল। সেই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আমি আনন্দে মেতে উঠলাম। তাই গরমের প্রচণ্ড তাপ আমায় স্পর্শ করতে পারে নি। আমরা ২৬/৫/২০১১ তারিখে দুপুর ২টার সময় রওনা হলাম ও দুপুর ৩টের সময় হাওড়া স্টেশনে গেলাম। সেখান থেকে আমরা নির্দিষ্ট স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলাম ট্রেন বিকেল ৪টার সময় ছাড়ল। তারপর আমরা ট্রেনের নির্দিষ্ট কামরায় উঠলাম ও আমাদের জিনিসপত্র রাখলাম। তারপরের দিন আমরা বিহারের 'রক্সৌল' স্টেশনে নামলাম। সেখান থেকে ভারত সীমান্ত পার হয়ে আমরা নেপালে ঢুকে পড়লাম। এরপর আমরা নেপালে প্রবেশ করবার গেট দেখলাম। তারপর গাড়ি করে যাত্রার পর আমরা রাত ১১টার সময় 'পোখরায়' নামে একটি হোটেলে উঠলাম। তারপরের দিন আমরা সেখানে একটি মন্দিরে গেলাম ও নেপালীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি মিউজিয়াম দেখলাম। এরপর আমরা একটি ঝরনা ও নেপালের 'সতী' নদীর বরফ গলা জল দেখলাম। তারপর দিন সকালে আমরা হোটেলেই ছিলাম এরপর বিকালে একটি লেকে গেলাম। তারপর দিন আমরা নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে যাওয়ার জন্য রওনা হলাম। এরপর ১.৩০ মিনিটে গাড়ি চলার পর 'মনকামনা' মন্দিরে যাবার জন্য একটি জায়গায় গেলাম। মন্দিরটি পাহাড়ের অনেক উপরে এজন্য রোপওয়েতে যেতে হল। রোপওয়েতে ওঠার সময়ই আমরা দেখলাম আমাদের নীচের থেকে একটি নদী বয়ে যাচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে উপরে ওঠার সময় নানাধরনের পাহাড়ী গাছ ও ফুলগাছ দেখলাম। পাহাড়ের অনেক উপরেও অনেকের বাড়ি ছিল। রোপওয়েতে তিনটি পাহাড় পেরোবার পর আমরা মন্দিরে পৌঁছালাম। সেখানে পৌঁছে আমরা অনেক লম্বা লাইন দেখলাম ও সেই লাইনে দাঁড়ালাম।

মা বলেছেন, এই মন্দিরে মনের কিছু কামনা করলে তা পূরণ হয়। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অধৈর্য হয়ে গেলাম। তারপর অনেকক্ষণবাদে দেবীর দর্শন পেলাম ও মনের কামনা পূরণ করে রোপওয়েতে ফিরে এলাম। সেখান থেকে ২.৩০ ঘণ্টা গাড়ি চলবার পর আমরা নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছালাম। সেখানে হোটেলে ঢোকার পূর্বে একটি বৌদ্ধ মন্দিরে ঢুকলাম। দেখে মনে হল মন্দিরটি অনেক পুরনো। নেপালী ভাষায় নাম থাকায় সেটির নাম আর জানতে পারেনি। সেখান থেকে পুরো শহর দেখা গেল ও পাহাড়ের উপর এত সুন্দর শহর দেখে অবাক

হতে হল। তারপর আমরা পশুপতিনাথ মন্দিরে গেলাম ও সেখান থেকে শিবের দর্শন করে গাড়িতে ফিরে এলাম। একে একে গুহ্যেশ্বরী, নীলাদ্রি ইত্যাদি মন্দির দেখলাম তার পরদিন সকালে খেয়ে নানা জায়গায় ঘুরলাম।

তার পরদিন অন্যরা সবাই নাগরকোট নামে একটি জায়গায় গেছিল। আমার শরীর খারাপ থাকায় আমি ও একটি কাকু হোটেলে ছিলাম। নাগরকোট বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গ এভারেস্ট দেখা যায় কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন থাকায় এভারেস্ট দেখা যায়নি। তার পরদিন সকালবেলা মেঘ সরে যাওয়ায় আমাদের হোটেলের ছাদ থেকে এভারেস্টের কিছু অংশ দেখা গেল। সেই দিনই আমরা বিহারের রক্সৌলে ফিরে এলাম। আসার সময় 'দমন ভ্যালি' নামে একটি জায়গায় গেলাম। সেখানে আমরা মেঘের থেকে উপরে চলে এসেছিলাম। দমন ভ্যালি মনে হল যেন মেঘের দেশ। আমাদের দুপাশ থেকে গাড়ির উপর দিয়ে মেঘ চলতে লাগল। আশপাশ দিয়ে মেঘের আনাগোনা ও কখনও মেঘলা ও কখনও রোদ ঝলমল প্রকৃতিতে পাহাড়ের অপরূপ রূপ যেন রূপকথার দেশ মনে হল।

৪.৩০ সময় আমরা বিহারের রক্সৌলে পৌঁছলাম। পরদিন ১২.৩০ মিনিটে ট্রেনে উঠলাম এবং পরদিন ১টার সময় ট্রেন থেকে নামলাম। ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ফেরার পর আমার মন কিছুদিন নেপালেই রয়ে গেল।

অতিলোভে শাস্তি

শঙ্কর সাউ

অনেক আগের কথা। একটা দেশে একটা দুষ্টু রাজা ছিল। সেই রাজার নাম হরিশ চন্দ্র। সেই রাজা খুব দুষ্টু অত্যাচারি এবং লোভি ছিল। একবার তার মহলে একটি গোলাপ গাছ একটি গরু খেয়ে নেয়। রাজা দেখে সেই গরুটিকে মেরে ফেলে এবং গরুটির মালিকের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। একবার গরমকালে খুব গরম পড়ে। মাটি ফেটে যায়, জল শুকিয়ে যায়। তখন রাজা নিজের দেশে ছিল না। অন্য দেশে বেড়াতে গিয়েছিল। রাজা যখন নিজের দেশে ফিরল সে তখন মাটি ফেটে গেছে জল শুকিয়ে গেছে। রাজার সঙ্গে দুজন সাথী থাকত। একটির নাম সত্য আর একটির নাম মিথ্যা। জল শুকনোর খবর পেয়ে সত্য বলল, মহারাজ আমাদের তো অনেক বড়ো জলের ট্যাঙ্ক আছে। আমরা যদি গ্রামবাসীদের একটু জল দিই। মিথ্যা বলল গ্রামবাসীদের জল দিলে আমরা কী খাবো। তখন মহারাজা বলল সত্যিতো গ্রামবাসীদের জল দিলে আমরা কী খাবো। তখন মিথ্যা বলল মহারাজ আমরা মাঠে চাষ করা ধান সব নিয়ে নেবো, সত্য বলল আমাদের ঘরে তো অনেক ধান আছে আমরা কী করব আবার ধান নিয়ে। মিথ্যা বলল ধান রপ্তানি করে অন্য জিনিস আমদানি করবো। সত্য বলল, গ্রামবাসীরা তো না খেয়ে মারা যাবে। মিথ্যা বলল, কিছু দিন না খেলে মারা যাবে না। মহারাজ বলল ঠিক আছে, মিথ্যা তুমি এখুনি যেয়ে কিছু লোক নিয়ে মাঠের সব ধান তুলে নাও। ঠিক আছে মহারাজ। তখন সত্য গ্রামে গিয়ে একটা মন্দিরে কৃষ্ণ ঠাকুরকে বলল, মহারাজ সব ধান নিয়ে নিয়েছে গ্রামবাসী কী খাবে। সত্য বারবার ঠাকুরকে বলতে থাকল। তখন কৃষ্ণ ঠাকুর মহারাজের পরীক্ষা নিতে মর্ত্যে এল। কৃষ্ণ ঠাকুর ভিখারি বেশে মর্ত্যে এলো। মহারাজের কাছে গিয়ে বলল মহারাজ আমাকে ভিক্ষা দিন কিছু ধান দিন। বা জল দিন মহারাজ বলল আমার কাছে জল বা ধান তো নেই। কৃষ্ণ ঠাকুর বলল, এই তো ধান। এটি ধান না পাথর। কৃষ্ণ ঠাকুরকে ধাক্কা মেরে বাইরে বের করে দিলো। কৃষ্ণ ঠাকুর বলল, তোর কথা সত্যি হয়, যেন সব খাবারের জিনিস পাথরের হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর সব পাথর হয়ে গেল তখন মহারাজ বুকের ব্যথায় মরে গেল। তখন সত্য বলল অতি লোভের শাস্তি মৃত্যু।

"যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে; যে জাতটা বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট, যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।"

—স্বামীজি

শিল্পীর পরিচয়

সমরেশ পর্বত

প্রতিটি সাধারণ মানুষের মনে যেমন আশা থাকে, তেমনি শিল্পী মানুষেরও মনে আশা থাকে নতুন কিছু সৃষ্টির। এরা সাধারণ মানুষের থেকে একটু আলাদা মনের। সকলের মাঝে এদের নানারকম সৃষ্টি ছড়িয়ে থাকে নানাভাবে পৃথিবীর বুকে। কেউ একবারও সেই জিনিসটা কেনবার সময় জানতে চায়না শিল্পী মানুষের পরিচয়। কেবলই তারা পয়সা দিয়ে কিনতে চায় তাদের সৃষ্টির ফসল। সমাজের বুকে ঘিরে আছে নানারকম শিল্পী তাদের কাউকেই আমরা চিনিনা। শুধু জেনে আছি কে কি তৈরী করলে কি শিল্পী হওয়া যায়। যারা সৃষ্টির পথে জীবন উৎসর্গ করে বেঁচে আছে তাদের সবাই কি সমান সম্মান পায়? কেউ এসেছে কি হারিয়ে গেছেন, এদের হারিয়ে কোথায় যেন মনীষীরা আকাশের ছড়িয়ে গেছে বাংলার মাটিতে। কামার, কুমোর, ঢাকি, ঘরামি, মুচি এরাও ছোট বড়ো মাপের শিল্পী। আজ কেনা-বেচার বাজারে নিলামে হারাচ্ছে মানুষ তাদের আবিষ্কারকে। কিনে নিচ্ছে চড়া দামে কিছু ধনী জাতের শৌখিন মানুষ। পেছনে পড়ে থাকে সেই মহান শিল্পী। এযুগে শিল্পীকে আমরা সম্মান দিইনা। আবার অনেক শিল্পী আছে তাদের ভালোবাসা দিতে এই মানুষগুলোই সেলাম জানাচ্ছে, অভিনন্দন জানাচ্ছে, ফুলের মালা পরিয়ে। তার বিনিময়ে শিল্পীকে দিতে হচ্ছে নিজেদের কষ্টের টাকা। আসল-নকলের বাজারে কোনটি আসল তা আমরা ভুলে গেছি। শুধুই নকল নিয়েই নাড়াচাড়া করি সারাক্ষণ। এটা সাধারণ মানুষের কাছে লজ্জার। একজন গায়ক যেমন তার সুর বিক্রি করে পয়সা পায় তেমনি ঘরামিও মানুষের ঘর ছেয়ে পয়সা পায়। কিন্তু গায়ক যে সম্মান পায় তা ঘরামি কোনোদিনই পাবে না বাংলার মানুষের কাছে। শুধু ঘরামির পরিচয়ই এদের শেষ পরিচয়। এরা ভালোবাসা দিয়ে তৈরি করে প্রতিটি জিনিস, তাই চাওনা সকলের মাঝে মঞ্চের আলোতে তাদের জোর করে দেখানো হোক তাদের মহত্ত্ব।

ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী।

— বিবেকানন্দ

ব্রহ্মদৈত্য

সামিনউদ্দিন মিশ্র

একটি ছোট গ্রামে দরিদ্র অভাবিনী মাঠের মাঝখানে একটি ছোট কুঁড়ে ঘরে এক পণ্ডিত ও তাঁর স্ত্রী বাস করতেন। সেই গ্রামে কিছুদূরে রাস্তার ধারে একটি বটগাছ ছিল। একদিন সেই রাস্তা দিয়ে একটি লোক রাতের বেলা যাচ্ছিল। ঠিক তার পরের দিন সকালবেলা সবাই দেখল যে লোকটি ঘাড় মটকে পড়ে আছে। তখন সবাই জানল যে এই ভুতুড়ে গাছে ভূত পেত্নী ও তাদের রাজা ব্রহ্মদৈত্য বাস করত এবং এই কথাটি পাহারাদার জমিদার মহাশয়কে বললেন। কিছুদিন পরে জমিদারের কার্যালয়ে আসার জন্য গ্রামে ঘোষণা করলেন। তখন সবাই জমিদার মহাশয়ের কার্যালয়ে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ পরে কাজকর্ম শুরু হল। তখন জমিদার মহাশয় সবাইকে বললেন যে কেউ অমাবস্যার রাতে ভুতুড়ে গাছের একটা ডাল কেটে আনতে পারবে তাকে আমি ১০০ বিঘা জমি বিনা পয়সায় এবং নতুন পাকাবাড়ি দেব। তখন সবাই বলাবলি করতে লাগল যদি বেঁচে থাকি তবে তো জমি ভোগ করব। তক্ষুনি দলের মধ্যে থেকে পণ্ডিত মশাই এসে বললেন আমি পারব। তখন জমিদার মহাশয় বললেন কোন চালাকি করলে তোমার মৃত্যুদণ্ড হবে। তিনি বললেন আমি ঐ ভুতুড়ে গাছের ডালই কেটে আনব। আপনি সকালে তা গিয়ে দেখে আসবেন। তখন জমিদার মহাশয় বললেন, ঠিক আছে তাই হবে। পণ্ডিতমশাই বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীকে সব কথা বললেন। তখন স্ত্রীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। স্ত্রী বললেন কি দরকার ছিল এই কাজ করার। পণ্ডিত বললেন যদি খাওয়া পরা না পাই তাহলে বেঁচে থাকার কী দরকার? সেই বলে পরের দিন অমাবস্যার রাতে রওনা দিলেন এবং সেই ভুতুড়ে গাছটির দিকে এগোলেন। তাঁর গা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। যখন সেই গাছের ডালে একটা কোপ দিলেন তখন ভূত, পেত্নী, দৈত্য, দানব, রাক্ষস এবং ভূতের রাজা ব্রহ্মদৈত্য হাজির হল। তখন তারা জিজ্ঞাসা করল কেন তুমি এই ব্রহ্মদৈত্য গাছের ডাল কাটছো? তখন পণ্ডিত মশাই বললেন আমার বাড়িতে খুব অভাব, না খেয়ে দিন যায় তাই আমি যদি এই একটা গাছের ডাল পাই তাহলে আমার সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। তখন ব্রহ্মদৈত্য ভাবল সত্যিই এ খুব দুঃখী তখন সে নিজেই একটা ডাল কেটে দিল। তার পরের দিন পণ্ডিতমশাই সেটা নিয়ে জমিদার মহাশয়ের কাছে এলেন এবং ডালটা দেখালেন। তখন জমিদার মহাশয় বিশ্বাস না করে পাহারাদারদের নিয়ে দিনের বেলা গেলেন। একটা পাহারাদারকে বললেন গাছে উঠে ডালটা কাটা ডালের সাথে মেলাও তো। তখন পাহারাদার বলল, হাঁ জমিদার মহাশয় মিলে যাচ্ছে। তখন জমিদার মহাশয় বললেন বা, বা, বা। পণ্ডিত তোমার সাহস আছে। তখন জমিদার মহাশয় তাঁকে

বিঘা খাজনায় ১০০ বিঘা জমি দিয়ে দিলেন তখন পণ্ডিত ও তার স্ত্রী খুব খুশি। তখন পণ্ডিতের জমির ধান পেকে গেছে একদিনের মধ্যে কাটতে হবে পণ্ডিত ভাবলেন হাতে টাকাকড়ি তো নেই। তখন তিনি আবার সেই ব্রহ্মদৈত্যের কাছে গেলেন। তখন পণ্ডিত বললেন আপনি যদি আমাকে আমার খেতে ধান কাটতে সাহায্য করেন, আমি তাহলে আপনাদের জন্য কিছু করব। তখন ব্রহ্মদৈত্য বলল ঠিক আছে তুমি ১০০ টা কাস্তে এখানে রেখে যাও। তার পরের দিন কামারশালায় গিয়ে বললেন আপনি যদি ১০০ টা কাস্তে দেন তাহলে আমি আপনাকে এক বস্তা ধান দেব। তখন সে ১০০ টা কাস্তে দিল। তিনি সেগুলো নিয়ে সেখানে রেখে আসলেন। তখন ব্রহ্মদৈত্য ভূতদের বলল, তোমরা ধানগুলি কেটে ঝেড়ে পণ্ডিতের গোলায় রেখে এসো। তখন ভূতেরা তার রাজার কথা শুনল এবং ধান কেটে ঝেড়ে তার গোলায় রেখে আসল। তার পরের দিন সকালবেলা দেখলেন ধান গোলায় ভর্তি তখন কামারকে এক বস্তা ধান দিয়ে আসল। ফিরে এসে তিনি শ্রাদ্ধ করলেন এবং সেই পাপী আত্মারা ভালো হয়ে গেল এবং ভগবান তাদেরকে নিজের কাছে নিয়ে নিল।

মেহগনির মঞ্চ জুড়ি
পঞ্চ হাজার গ্রন্থ;
সোনার জলে নাগ পড়ে না,
খোলে না কেউ পাতা,
অনাস্বাদিত মধু যেমন
বৃথা অন্নদাতা।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুপ্তধনের রহস্য

নম্রতা ঘোষ

বসিরহাটের নিকটবর্তী খোলাই ছাড়া গ্রামে কুমকুমের বাস বাবা-মায়ের একমাত্র কন্যা সন্তান সে। সে বসিরহাট বালিকা বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। বন্ধুদের সাথে টাকীতে পিকনিক করতে গিয়ে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গ্রামে ফেরা বন্ধুদের কাছ থেকে এই খবর শোনামাত্র তার মা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কুমকুমের বাবা ছিলেন সেই অঞ্চলের স্বনামধন্য এক মৎস ব্যবসায়ী। কুমকুমের কাকা বহুকাল পূর্বেই নিরুদ্দেশ তার পেছনে রয়েছে গুপ্তধনের রহস্য। কুমকুমদের দেশ ছিল রাজস্থানের যোধপুরের নিকটবর্তী কোন এক গ্রামে। কুমকুমের প্রপিতামহের ধারণা ছিল তাদের বাড়ির কুয়োর নীচে কোন সুড়ঙ্গ রয়েছে। কারণ তার ধারণা ছিল মানসিংহ তার সম্পত্তির বহু মূল্যবান সোনা ও স্বর্ণমুদ্রা ঐ সুড়ঙ্গের ভিতরে সঞ্চিত রেখেছিল। তার ধারণা অমূলক ছিল না, কারণ তার খুব কাছেই ছিল মানসিংহের দূর্গ। কুমকুমের দাদু সেই গুপ্তধন লাভের আশায় সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশের পর তিনি আর ফিরে না আসায়, কুমকুমের বাবা গুপ্তধনের মোহ ত্যাগ করলেন। তার কাকা নীরেন্দ্রনাথ শর্মার কাছে বসিরহাটে ফিরে আসেন আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে। তারপর তিনি এখানে মৎস ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ লাভ করেন এবং ঐ গ্রামেই মস্ত বড়ো দুইতলা বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর বাড়িতে এক ভৃত্য ছিল তার নাম নিতাই। কিন্তু কুমকুমের নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনার দিন সাতেক পর থানা থেকে একদিন খবর আসে যে কুমকুমের লাশ ইছামতী নদীতে সাঁকচুড়া গ্রামে পাওয়া গেছে। তার পিতা গিয়ে মেয়ের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ করেন। এই ঘটনার মাস তিনেক পর সুদূর পাঞ্জাব থেকে হঠাৎ একদিন কুমকুমের চিঠি এলে তিনি সেই চিঠি পড়ে আঁতকে ওঠেন, চিঠিটিতে লেখা ছিল—

শ্রীচরণেষু বাবা,

আমি তোমার একমাত্র কন্যা কুমকুম জীবিত। আমি অত্যন্ত সুখে শান্তিতে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা শহরে বসবাস করছি। আনন্দের বিষয় আমি এখানে আমার কাকার সন্ধান পেয়েছি। আমার এখন বাড়ি ফেরার ইচ্ছে নেই। তুমি ও মা শান্তিতে থেকো...।

ইতি

তোমার কুমকুম

তিনি চিঠিটি থানায় নিয়ে গেলে পুলিশ তা দেখে তাকে ঠাট্টার ছলে বলেন "অরুণবাবু আপনি নিজে উপস্থিত থেকেই তো নিজের মেয়ের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছেন। তাহলে

আপনি এই ব্যাপারে এত চিন্তা করছেন কেন?" তারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বাড়ি ফিরলে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠেন তার একমাত্র ভাই তরুণবাবুকে দেখে। তিনি তাকে কুমকুমের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি এমনভাব দেখান যেন তিনি ঐ নামের কাউকে চেনেনই না। যাই হোক অরুণবাবু তার ভাইকে সেই নিয়ে আর প্রশ্ন না করে তার দীর্ঘ চব্বিশ বছরের নিরুদ্দেশ থাকার সময় কীভাবে জীবন কাটিয়েছেন তা নিয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সেইদিন রাত্রিরে তরুণবাবু তার দাদার বাড়িতেই থাকলেন। পরদিন সকালে অরুণবাবু তাঁর ভাইয়ের ঘরে গিয়ে ভাইকে ইংরেজিতে লেখা একটি চিঠি পান যার মর্মার্থ হল— "গুপ্তধন লাভ করতে হলে তুমি শীঘ্রই আমাদের পৈতৃক ভিটেয় উপস্থিত হও। আমি বিদায় নিলাম..." অরুণবাবু কালবিলম্ব আর না করে তাঁর স্ত্রীকে কলকাতার শ্বশুরবাড়িতে রেখে পরদিন রাতেই জয়পুর এক্সপ্রেস ধরে রাজস্থানে রওনা দেন। সেখানে গিয়ে তিনি যা দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেল। দেখলেন তার ভাই তরুণবাবু তার মেয়ের কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তরুণবাবুর নির্দেশে তার দলের লোকেরা অরুণবাবুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। তখন তরুণবাবু তার দাদাকে বলে, আমি নিরুদ্দেশ হওয়ার পর গুপ্তধনের আশায় জোর করে তুমি বাবাকে সুড়ঙ্গে নামতে বাধ্য কর এবং তার কাছ থেকে সমস্ত সম্পত্তি তুমি তোমার নামে লিখিয়ে নাও যাতে আমি তার ভাগ না পাই। গোপনে তুমি বাবাকে ঘুমের ঔষধ খাইয়ে হত্যা কর। অথচ, আমি নিরুদ্দেশ হওয়ার ভান করে গোপনে তোমাদের সমস্ত খবরাখবর রাখি। এমনকী তুমি যে গোপনে চোরাই কারবার শুরু করেছিলে তাও আমি জানি। আমার লোকেরাই তোমার মেয়েকে ধরে নিয়ে আসে। তার বদলে সেখানে দিন সাতেক পর অন্য একটি মেয়ের লাশ সেখানে নিয়ে গিয়ে কুমকুমের জামাকাপড় এমনকী তার জুতো, মোজা পরিয়ে রেখে আসি। আর তুমি তাকে নিজের মেয়ে ভেবে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ করে। নিমাই যদি পুলিশকে বাবার তোমার দ্বারা নিহত হওয়ার কথা বলে দেয় সেই ভয়ে তুমি তাকে খুন কর। তার প্রমাণ আমার কাছে আছে এই চিঠি—। তোমার উদ্দেশ্যেই ছিল গুপ্তধনের লোভ দেখিয়ে গোপনে তার একটা নক্সা তৈরি করে আমাকে মেরে ফেলা কিন্তু তোমার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আসলে মৃত্যুফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি জানা সত্ত্বেও আমাকে টোপ দিয়েছিলে যাতে আমি সেই লোভের বশবর্তী হয়ে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করি ও আমার মৃত্যু হয় এবং তার ফলে এই সুবৃহৎ অট্টালিকা ও ১০০ বিঘা জমি ও ব্যাঙ্কের ২৫ লক্ষ টাকার করায়ত্ব করাই ছিল তোমার মূল উদ্দেশ্য। তাই গুপ্তধনের টোপ দেখিয়ে তোমাকে এখানে নিয়ে এসে এখানকার পুলিশদের দ্বারা তোমাকে বন্দি করিয়ে জেলে পাঠাব, যাতে খুনের হত্যা করার জন্য তুমি সারাজীবন জেলের ঘানি টেনে যাও। তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকো আমি তোমার কুমকুমকে মারব না আমি তাকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেব। আর আমি বাকী জীবনটা তীর্থস্থানে কাটিয়ে দেবো। তারপর পুলিশ অরুণবাবুর হাতে হাতকড়া পরিয়ে জেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ নিতে থাকে।

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম

শীলা ব্যানার্জী

- বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহাসাগর হচ্ছে আর্কটিক মহাসাগর।
- বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মহাদেশ হচ্ছে ওশেনিয়া বা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ। এটি পৃথিবীর মোট স্থলভাগের ৫.৪৮ ভাগ।
- বিশ্বের ক্ষুদ্রতম দেশ ভ্যাটিকান। এর আয়তন ৪৪ হেক্টর।
- সবচেয়ে ছোট নদী আমেরিকার লিঙ্কন শহরের ডি. রিভার। এটি ডেভিল্স লেক থেকে বের হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছে।
- বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সাপ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের লেপটোটাইফ্লপস বিলিনিয়াটা সাপ। পূর্ণ বয়স্ক এই সাপের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য হতে পারে ১০.১৬ সেন্টিমিটার।
- কিউবার 'বী হামিং বার্ড' হল বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পাখি। লেজসহ এদের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৫.৭৯ সেন্টিমিটার।
- বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রজাতির বানর হল ইঁদুরবানর। উত্তর পেরু ও পশ্চিম ব্রাজিলের 'ওয়েস্টীন' মারমো নামের বানর গোষ্ঠী। পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় এদের ওজন ১.৭ থেকে ২.৮১ আউন্স পর্যন্ত হয়।
- ক্ষুদ্রতম হরিণ হচ্ছে ইকুয়েডরের 'পুডু হরিণ'। পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় এরা ৩৩-৩৮ সেমি লম্বা হয়। এদের ওজন ৮-৯ কেজি হয়।
- পশ্চিম ভারতে উলফিয়া অস্ট্রেলিয়ানা গাছের ফুল সবচেয়ে ছোট। এর ব্যাস ০.৩৩ মিলিমিটার।
- ১৯৭৯ সালে নেদারল্যান্ডের শিল্পী মিকুদিনের আঁকা 'লাই অফ কাণ্ট্রি' নামের চিত্রটি সবচেয়ে ছোট চিত্র। এর আয়তন ১ ইঞ্চির ১ হাজার ভাগের ৮ ভাগ।
- বিশ্বের সবচেয়ে ছোট থিয়েটার হল স্কটল্যান্ডের মুলী দ্বীপের 'মুলিটিল থিয়েটার'। এর আসন সংখ্যা ৩৬।
- চীনের পূর্বাঞ্চলীয় জিনজিয়াং এলাকায় এক কৃষকের গৃহে পাওয়া গেছে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম কোরান সংকলন। এর দৈর্ঘ্য ২.৭ সেমি, প্রস্থ ১.০ সেমি এবং পুরুত্ব ১ সেমি, ওজন ৫.১ গ্রাম। এর পৃষ্ঠাগুলো শতকের তাসের মতো পাতলা।

কম্পিউটার জানা অজানা

তৃপ্তি ভট্টাচার্য (শিক্ষিকা)

"কম্পিউটার শিক্ষা"

যেভাবে আজ বিশ্বজুড়ে জীবনের প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে তার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে তাকে অস্বীকার করা যায় না।

কম্পিউটার জানা আর না জানার তফাৎটা তখনই বোঝা যাবে যখন কম্পিউটারকে একটা দামী যন্ত্র হিসাবে না দেখে একে মানুষের অতীব সাহায্যকারী বন্ধু হিসাবে ভাবতে পারা যাবে।

আমার এই ছোট্ট প্রয়াস এখানে আমি তোমাদেরকে এই কম্পিউটার বিষয় নিয়ে কোনো পুরানো আলোচনা করব না কারণ আজ আমরা সবাই কম্পিউটার বিষয় নিয়ে কম বেশি সকলে ও ভালোভাবেই পরিচিত।

কম্পিউটারের প্রাথমিক পরিচয়-এর জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যথাযথভাবে শিক্ষা অর্জন করে। তাই আমি তোমাদের এই কম্পিউটার বিষয়-এর উপর এমন কিছু তথ্য জানাতে চাইব যেটা হয়তো এখনও তোমাদের কাছে অজানা।

তুমি কী জানো :—

1. COMPUTER-এর পুরো কথাটি—
   - C – Commonly (কমনলি)
   - O – Operating (অপারেটিং)
   - M – Machine (মেশিন)
   - P – Particularly (পার্টিকুলারলি)
   - U – Used for (ইউজড্ ফর)
   - T – Technical (টেকনিক্যাল)
   - E – Educational (এডুকেশনাল)
   - R – Research (রিসার্চ)
2. প্রথম কী বোর্ড 1864 সালে আবিষ্কার করা হয়েছিল।
3. Keyboard-এর অফিসিয়াল নাম হল QWERTY। যেটি কী বোর্ড-এর সবচেয়ে উপর সারির প্রথম ছয়টি অক্ষর দিয়ে তৈরি।
4. QWERTY কী বোর্ড-এর সাজানো অথবা পরিকাঠামো Christopher sholes (ক্রিস্টোফার 111) তৈরি করেছিলেন।
5. Typewriter (টাইপরাইটার) সবচেয়ে লম্বা কী ওয়ার্ড যেটি কী বোর্ড-এর শুধুমাত্র উপর সারির অক্ষর ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে।
6. প্রথম Computer Mouse 1964 সালে Douglas C Engelbart (ডগলাস সী. এঞ্জেলবার্ট) নামে ইঞ্জিনিয়ার-রা আবিষ্কার করেছিলেন। যেটি কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।
7. Computer Mouse কথাটি প্রথমে MICE নামে প্রচলিত ছিল। 1984 সালে The American Heritage Dictionary of the English languages (দ্য আমেরিকান হেরিটেজ ডিকশনারী অফ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ) সরকারি ভাবে এর নামকরণ করেছিল Mouse।

8. কম্পিউটার মনিটর তৈরি করতে প্লাস্টিক, গ্লাস আর মেটাল ব্যবহার করা হয়।

9. পৃথিবীর প্রথম দ্রুততম কম্পিউটার 1993 সালে CM-5 কম্পিউটার ছিল। এই কম্পিউটারটি Per Second-এ 131 বিলিয়ন কাজ সম্পাদন করতে পারত।

10. কম্পিউটারের কর্ণধার Bill Gates (বিল গেটস্)-এর গাড়ি Macintosh Computer (মেকিনটোশ) ব্যবহার করে Designed করা হয়েছে।

11. প্রথম কম্পিউটার সফল একক হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ তৈরি করেছিলেন 1979 সালে Seagate। সেটিতে শুধুমাত্র 5 MB তথ্য সঞ্চয় করার ক্ষমতা ছিল।

12. কম্পিউটার কোনো কারণে থেমে গেলে বা কাজ করা বন্ধ করে দিলে আমরা [Ctrl] + [Alt] + [del] Key ব্যবহার করি। এই কী (Key) সমন্বয়ে তৈরি করেছিলেন David Bradley (ডেভিড ব্রেডলি)।

13. প্রথম কম্পিউটার ভাইরাস দিয়ে পরিচয় করিয়েছিলেন 1986 সালে এ Farooq Alvi Brothers (ফারুক আলভী ব্রাদার্স) Basit Farooq Alvi Amjad Farooq Alvi (বাসিত ফারুক আলভী এবং আমজাদ ফারুক আলভী)।

14. Internet-এর জনক Licklider (লিকলিডার) কে বলা হয় কারণ তিনি প্রথম বিশ্বব্যাপী কম্পিউটারগুলির সাথে যোগাযোগ করার ধারণা প্রস্তুত করেছিলেন।

15. ইন্টারনেট প্রথমে Galactic Network (গ্যালাকটিক নেটওয়ার্ক) নাম দিয়ে প্রচলিত ছিল। 1962 সালে এর নাম ইন্টারনেট করা হয়েছে।

16. প্রথম ইন্টারনেট ভাইরাস তৈরি করেছিলেন Robert T. Morris Jr. (রোবার্ট টি মরিস জুনিয়র)। এটি একসাথে 6000 কম্পিউটারকে প্রভাবিত করেছিল।

17. Internet-এ ব্যবহৃত Google একটি জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন যেখানে একদিনে প্রায় 1 বিলিয়ন তথ্য সার্চ করা হয়।

18. Google শব্দটি Google শব্দ দিয়ে তৈরি হয়। এটির একটি গাণিতিক ব্যাখ্যা আছে যেখানে OO (ইংলিশ অক্ষরের ও) Hundred Zero-কে বোঝায়।

19. প্রথমে E-mail এবং তারপর Website-এর ব্যবহার এর প্রচলন শুরু হয়েছে।

20. পৃথিবীতে এখন China ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম। China-তে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর বর্তমান সংখ্যা 36,00,00,000 এবং US দ্বিতীয় স্থানে। US-এ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর বর্তমান সংখ্যা 227,719,000।

21. নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রথম E-mail তৈরি করে পাঠিয়েছিলেন Ray Tomlinson (রে টমলিনসন্)।

22. প্রথম E-mail 1991 সালে Space থেকে পাঠানো হয়েছিল।

23. সম্পূর্ণ পৃথিবীতে 160 বিলিয়ন E-mail প্রতিদিন পাঠানো হয়েছিল।

24. Computer Hacking (হ্যাকিং মানে কম্পিউটার সিস্টেম-এ ঢুকে জরুরি তথ্য চুরি করা) এর জন্ম 1950 সালে হয়েছিল।

25. পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি নেট ব্যবহার করে চীন দেশ। এখানে নেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা সম্পূর্ণ পৃথিবীর 75%।

সবাই চলো বন্ধু-বাড়ি

মানস পাল (গ্রন্থাগারিক)

আমাদের জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও অবদান অপরিসীম। গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত থাকে বিভিন্ন ধরনের বই, পত্রপত্রিকা আরও কত কী। এসবই আমাদের মনের চাহিদা পূরণ করে, পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়। জগতের মনীষী, বিজ্ঞানী আরও বিভিন্ন প্রাঙ্গণে যাঁরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন সকলেই কোন না কোনোভাবে গ্রন্থাগারের সঙ্গে জড়িত। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, যার জন্য সে পৃথিবীর অন্য সকল জীবের থেকে আলাদা তার উৎস হলো জ্ঞান, বুদ্ধি। বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে চর্চা বা পুস্তক পাঠের মাধ্যমে। পাঠাগার বা গ্রন্থাগার হলো তার আকর।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক হলেন ড. এস. আর. রঙ্গনাথন। তাঁর মতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি সূত্র (Five Laws of Library Science) হলো :

1) Books are for use অর্থাৎ বই ব্যবহারের জন্য শুধুই সাজিয়ে রাখার জন্য নয়।

2) Every reader his book অর্থাৎ প্রত্যেক ধরনের পাঠকের জন্য বই থাকবে গ্রন্থাগারে।

3) Every book its reader অর্থাৎ প্রতিটি বইয়েরই পাঠক আছে।

4) Save the time of the reader অর্থাৎ পাঠককে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োজনীয় বই বা তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

5) Library is a growing organism অর্থাৎ গ্রন্থাগার হলো ক্রমবর্ধমান জীবদেহের মতো অর্থাৎ পুস্তক সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, ফলে গ্রন্থাগারও আয়তনে বাড়ছে।

তবে গ্রন্থাগার কি ধরনের, প্রধানত তার উপর নির্ভর করে এর কার্যকারিতা। যেমন— গ্রন্থাগারের শ্রেণিবিভাগ বলতে অর্থাৎ কোন ধরনের পাঠক এটি ব্যবহার করছে সেটিই প্রধান বিষয়।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার মূলত নিম্ন ধরনের :

1) সাধারণ গ্রন্থাগার (Public Library)

2) শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার (Academic Library)

3) বিশেষ গ্রন্থাগার (Special Library)

4) জাতীয় গ্রন্থাগার (National Library)

শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের অঙ্গ হলো আমাদের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার (School Library)। এরকম গ্রন্থাগারের মধ্যে আছে মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার (College Library) আর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (University Library)।

তবে গ্রন্থাগারের কাজ প্রধানত নিম্নরূপ :

1) বই সংগ্রহ (Book Acquisition)

2) বই শ্রেণীকরণ / তালিকা তৈরিকরণ (Book Classification / Cataloguing)

3) বই রক্ষণাবেক্ষণ (Book Maintenance)

4) তথ্য এবং বাড়িতে বই দেবার পরিষেবা (Reference and Lending service)

আসল কথা হলো পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারকে মানুষের কাছে নিয়ে আসে গ্রন্থাগার যা শুধু আমাদের শিক্ষিত করে তাই-ই নয়, মনের প্রসারতা বাড়ায়। বই পড়ে আমরা আনন্দ পাই আবার আমাদের অনুসন্ধিৎসু মনের চাহিদাও পূরণ করে। বই লেখক ও পাঠকের মধ্যে সেতুর কাজ করে। তেমনই মানুষে মানুষে মেলবন্ধন ঘটায় গ্রন্থাগার। তাই বই আমাদের পরম বন্ধু আর গ্রন্থাগার হলো মহামিলনক্ষেত্র।

বর্তমান সময়ে আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, ছাত্রসমাজ তথা যুবসমাজ বই বিমুখ হচ্ছে। তার অন্যতম কারণ প্রযুক্তির অত্যধিক ব্যবহার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সভ্যতার অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু বই ছাড়া মানবসভ্যতা কোনদিন এগিয়ে যেতে পারে না। সৃষ্টিশীল যে কোন কাজ করতে গেলে অবশ্যই বই-য়ের সাহায্য দরকার। এই সাহায্য ও প্রয়োজন মেটাতে পারে একমাত্র গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি। বই-এর বিকল্প একমাত্র বই-ই।

আমাদের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে আমাদের ছাত্র-ছাত্রী সহ অন্যান্যদের আরও উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে প্রধান শিক্ষক মহাশয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা, গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকর্মী, পরিচালন সমিতি, অভিভাবক-অভিভাবিকাদের বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদেরও এগিয়ে আসতে হবে যাতে তারা তাদের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচির বাইরে যে বিশাল জ্ঞানরাজ্য তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে তার সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারে। গ্রন্থাগারকে জীবন্ত করে তুলতে সকলের সমবেত সাহায্য একান্তভাবে প্রয়োজন। তবেই গ্রন্থাগার তথা বইজগৎ সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হবে। যা মানবকল্যাণে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারবে যুগ যুগ ধরে।

বই আমাদের বন্ধু
গ্রন্থাগার আমাদের
বন্ধু-বাড়ি,
এস পড়ি-পড়াই
সবাই মিলে
অনেক কিছু-ই করি।

"সুকঠোর সাধনা ও তপস্যা ব্যতীত কখনই
কোন মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করা যায় না।"

— বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

ধাঁধা — ১

আব্দুল কাইউম মুন্সী

১। তিন অক্ষরের নাম তার,
আগে [illegible]
[illegible] অক্ষর বাদ দিলে [illegible]
[illegible]
[illegible]।
(উত্তর : [illegible])

২। তিন অক্ষরের শব্দ,
আগে আর [illegible]
মাঝের অক্ষর কোপ পেলে,
পেরিয়ে চড়ে যাওয়া যায়।
(উত্তর : [illegible])

ধাঁধা — ২

অভিষেক সরকার / নুর আমিন মণ্ডল

১। তিন অক্ষরের নাম তার, পুরো ভূমিকম্প হয়
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে লোকে তাকে
[illegible]।

২। পাঁচ অক্ষরের ইংরেজি নাম সবার বাড়ী আছে,
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে সবার মাথায়
আছে।

৩। আছে নাড়, কান নাই, [illegible] হয় না,
সকল লোকে [illegible], [illegible] শুধু
[illegible]।

৪। ছয় অক্ষরের নামে একটি ফুটবল ক্লাব
হয়,
প্রথম তিন অক্ষর বাদ দিলে
সেখানে ফুল ফোটে।

৫। এক থালা কড়ি,
গুনতে না পারি।

৬। বুড়ো-বুড়ি খেতে করে হায় হায়
যুবক খেলে পরে ছুঁচি ছুঁচি
যায়।

উত্তর : ১। কম্পন, ২। Chair, ৩। [illegible], ৪। মোহনবাগান, ৫। তারা, ৬। [illegible]।

হাস্যকৌতুক

আরিফ আলি

১। ছেলে : বাবা আমি কলা খাব।
বাবা : পয়সা দেইনি তো কি দিয়ে খাবি?
ছেলে : কেন? দাঁতগুলি দিয়ে খাবো।

২। বাবা : রেজাল্ট হওয়ার পর মধুকে জিজ্ঞেস করল তুই অঙ্কে কত পেয়েছিস?
মধু : আমি যদুর চেয়ে ১০ কম পেয়েছি।
বাবা : যদু কত পেয়েছে?
মধু : যদু ১০ পেয়েছে।

৩। রহিম : রহিম করিমকে বলল যে তোর যখন গরম হয় তখন তুই কি করিস?
করিম : তখন আমি পাখার তলায় বসি।
রহিম : আর তোর যখন তাতে লাগে তখন কী করিস?
করিম : তখন পাখাটা চালিয়ে দিই।

"ছাত্র জীবনের উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষা পাশ ও স্বর্ণপদক লাভ নহে, দেশ সেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জন করা।"

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

প্রধান শিক্ষক সহ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ , বামে উপবিষ্ট — সেখ মতিউর রহমান (সভাপতি) , মধ্যে উপবিষ্ট — শ্রী প্রফুল্ল রায় (প্রধান শিক্ষক)
ডাইনে উপবিষ্ট — শ্রী দিব্যেন্দুশেখর ঘোষ (সম্পাদক), বামে দণ্ডায়মান ১ম — শ্রী প্রদীপ ঘোষ (সদস্য) , বামে দণ্ডায়মান ২য় — রেজাউল ইসলাম (সদস্য)
বামে দণ্ডায়মান ৩য় — শ্রী শিবনাথ নাথ (সহ-সভাপতি), বামে দণ্ডায়মান ৪র্থ — শ্রী দীপু বৈদ্য (সদস্য)

পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীবৃন্দ।